www.iscalibrary.com

তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

প্রথম খণ্ড

[সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাক্বারা পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ওহীর তাৎপর্য	১
ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি	৪
কোরআন নাযিলের ইতিহাস	৬
সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত	৭
মক্কী ও মদনী আয়াত	৭
শানে নযুল প্রসঙ্গে	১২
সাত হরফ বা সাত ক্বেরাআত প্রসঙ্গ	১৩
সাত ক্বারী	১৮
কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস	২০
ওহী লিপিবদ্ধকরণ	২২
তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা	৩০
নোক্‌তা	৩০
হরকত	৩১
মন্‌যিল	৩১
কয়েকটি যতি-চিহ্ন	৩৩
ইলমে তফসীর	৩৫
ইসরাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ	৩৯
তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন	৪০
কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর	৪৩
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে	৪৭
সূরা আল-ফাতিহা	৫৩
বিস্‌মিল্লাহর তফসীর	৫৭
সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু	৬২
মালিক কে?	৭০
সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা	৮০
সূরা আল-বাক্বারাহ্	৯৩
হরূফে মুকাত্তা'আত	৯৭
খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীল	১০৫
কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা	১২৩
নবী এবং ওলীগণের প্রতি দুর্ব্যবহারের পরিণাম	১২৫
তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন	১৩৭
কোরআন একটি স্থায়ী মু'জিযা	১৪৩
কিছু সন্দেহ ও তার জবাব	১৬৩
মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময়	১৮০
জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট	১৮১
আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য	১৮৬
ভাষা স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং	১৯১
পৃথিবীর খেলাফত	১৯২
পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা	১৯৭
সিজদার নির্দেশ	১৯৮
সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা	১৯৯
নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া	২০৮
আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ কি শাস্তি?	২১৬
মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা	২২৩
কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয	২২৪
ঈসালে-সওয়াব উপলক্ষে খতমে কোরআনের বিনিময় গ্রহণ	২২৫
খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবু হাযেম (র)-এর উপস্থিতির ঘটনা	২২৫
নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী	২৩৪
আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা	২৩৬

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার	২৩৭	ইজমা শরীয়তের দলীল	৪১০
খুশু বা বিনয়	২৩৯	কা'বা শরীফ ও কেবলা	৪১২
ধর্মীয় কাজে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ	২৬৭	সুন্নাহকে কোরআনের দ্বারা	
আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা	২৬৭	রহিতকরণ	৪১৩
অনন্তকাল দোযখবাস	২৭৯	নামাযে লাউডস্পীকার ব্যবহারের	
হযরত সুলায়মান ও যাদু	৩০০	মাসআলা	৪১৫
যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য	৩০৬	কেবলার দিক জানা সম্পর্কে	৪২০
শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩০৮	দ্বীনি ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক	৪২৯
আল্লাহ্‌র বিধানে নসখের স্বরূপ	৩১৩	সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া	৪৩০
বংশমর্যাদা বনাম ঈমান	৩২২	যিকিরের তাৎপর্য	৪৩৩
হযরত খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষাসমূহ	৩৪১	ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের	
হযরত খলীলুল্লাহ্‌র মক্কায় হিজরত		প্রতিকার	৪৩৪
ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা	৩৫০	আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের	
হেরেম সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩৫৪	হায়াত	৪৩৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া	৩৫৯	বিপদে ধৈর্য ধারণ	৪৪০
রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য	৩৬৬	দ্বীনের ইলম প্রচার করা ওয়াজিব	৪৪৫
পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য	৩৬৭	রসূলের হাদীস ও কোরআনের হুকুম	৪৪৭
অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ		লা'নত প্রসঙ্গ	৪৪৭
করা	৩৬৮	তওহীদের মর্মার্থ	৪৫০
হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা	৩৭১	অন্ধ অনুকরণ বনাম তকলীদ	৪৫৮
সংশোধনের নিমিত্ত চারিত্রিক		হালাল ও হারামের ফলাফল	৪৬১
প্রশিক্ষণ জরুরী	৩৭৪	মৃত জানোয়ার সম্পর্কিত মাসআলা	৪৬২
ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষাদান	৩৮৫	রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার	
বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল		মাসআলা	৪৬৫
সন্তানরা ভোগ করবে না	৩৮৭	শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ	৪৬৭
ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা	৩৯১	আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে	
ফেরেশতা ও রসূলের প্রতি ভালবাসায়		যা যবেহ্ করা হয়	৪৬৭
ভারসাম্য	৩৯২	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মানত	
দ্বীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা	৩৯৩	সম্পর্কিত মাসআলা	৪৭১
ইখলাসের তাৎপর্য	৩৯৫	নিরুপায় অবস্থার বিধি-বিধান	৪৭১
কেবলার বিবরণ	৪০০	ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার	৪৭২
মধ্যপন্থা ও মুসলিম সমাজ	৪০৩	ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি	৪৭৫
সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ		কিসাস বা হত্যার শাস্তি	৪৮৪
হওয়া শর্ত	৪১০	ওসীয়ত	৪৮৯

রোযার হুকুম	৪৯২	ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	৬০৭
রোযার ফিদ্‌ইয়া	৪৯৫	নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য	৬১১
পঞ্চম হুকুম–ই'তিকাফ	৫০৪	শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক	৬১৫
সেহরীর সময়সীমা	৫০৫	একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন	৬২২
ইসলামী বিধানই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে	৫১০	তালাকের উত্তম পন্থা	৬৩৪
হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা	৫১৪	আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি	৬৩৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব	৫২১	শিশুকে স্তন্যদান ও মায়ের ভরণ-পোষণ	৬৪১
জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম	৫২৩	ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম	৬৪৬
জিহাদে অর্থ ব্যয়	৫২৭	স্ত্রীর মোহর	৬৪৮
হজ্জ ও ওমরাহ্	৫৩৩	মহামারীগ্রস্ত এলাকা সম্পর্কিত হুকুম	৬৫৭
সকল মানুষ একই মিল্লাতভুক্ত ছিল	৫৬১	তালুত ও জালুতের কাহিনী	৬৬৭
জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ	৫৭৪	আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত	৬৭৬
শরাব ও জুয়া সম্পর্কে	৫৮০	হযরত ইবরাহীম ও মৃতকে পুনর্জীবন দান	৬৮৭
এতীমের মাল	৫৯৭	আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	৬৯৬
মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ	৫৯৯	সুদ প্রসঙ্গ	৭১৩
তালাক ও ইদ্দত	৬০৫	ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি	৭৪৯

অনুবাদকের আরয

সকল প্রজ্ঞার উৎস পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা। তিনিই অনুগ্রহ করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাক কালাম নাযিল করেছেন। তাঁর পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করার মত বোধশক্তি দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক সাধক মনীষী পাক কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যাখ্যা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মানবকুলের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান লোক।

আল্লাহর পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে-কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যপন্থী সাধক আলিমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন, পরিভাষায় সেটিই 'ইল্‌মে-তাফসীর' নামে খ্যাত। তাই, তফসীর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত খেয়াল-খুশী নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনি ইলমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে প্রতি যুগে উম্মতের জ্ঞানীগণ অনধিকার চর্চা এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র কালাম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং তফসীর — উভয়েরই প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান-গণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা বেশি। সেদিক থেকে বাংলায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিগণ এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাধনার ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

কোরআন সর্ববিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরন্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সবারই জীবন-পথের সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ করবে। এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় ঐতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সাধনা অব্যাহত থাকবে। বলা বাহুল্য, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় কোরআন পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল।

সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সে অভাব দূর করার জরুরী প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক-কোরআনের তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত অভাব অনেকটা দূর হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন তফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের আট খণ্ডে সমাপ্ত উর্দুতে রচিত 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়।

আমার পক্ষে এ বিরাট তফসীর-গ্রন্থটি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা রীতিমত একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মহোত্তম পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে গ্রহণ করেছি। এ বিরাট কাজের পরিসমাপ্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুবাদ যাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরী হযরত শাহ রফীউদ্দীন (র) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর অনুসরণে কোরআন শরীফের আয়াতগুলোর উর্দু অনুবাদ করছেন। উল্লেখ্য যে, এ উভয় বুযুর্গই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেন। তবে এতে মূলের সাথে তরজমা বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্যহীন হয়নি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা যত্নের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

এ বিরাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে আমাকে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তাঁদের যোগ্য প্রতিফল দান করুন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সেক্রেটারী জনাব সাদেকউদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা বিভাগের হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলীর অফুরন্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু

কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ্ পাক এঁদের প্রত্যেককেই তাঁর কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে প্রদান করুন—এ দোয়া ছাড়া আমার পক্ষে করবার মত আর কিছু নেই।

রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের সকলেরই অন্তরের খবর রাখ। যাকে ইচ্ছা তুমি তোমার দীনের বিভিন্নমুখী জিহাদে নিয়োজিত কর। তোমার তওফীক ছাড়া তোমার কালাম বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই। তুমি দয়া করে আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবূল কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় কর!

মাওলা! আমি পাপী, এই ছিয়াহ্কারকে তুমিই দয়া করে এ কাজে নিয়োজিত করেছ। এ মহতি কাজের সুসমাপ্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে। দয়া করে তুমি কবূল কর! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

শা'বান, ১৪০০ হিজরী

লেখক পরিচিতি

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মা'আরেফুল কোরআন' সর্ব বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। এ অসাধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন চমৎকার যুক্তি ও মনীষাঋদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রন্থে তালাশ করা অর্থহীন। হাদীস, ফিকহ্, তাসাউফসহ দীনি ইলমের সবগুলো শাখায় একটা অসাধারণ ব্যুৎপত্তির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন 'মা'আরেফুল কোরআনে'র প্রতিটি পাতায় সমভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগম্য করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র কোরআনের কাওসার-সুধা পান করিয়ে চিরশান্তি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই পরওয়ারদেগার তাঁর এক সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা'আরেফুল কোরআনের ন্যায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার আকুতিতে।

এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (জ. ১৮৯৭ খৃ.; মৃ. ১৯৭৬ খৃ.) মা'আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> বান্দা মুহম্মদ শফী ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্ পাক দীনি ইলমের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দকে তাঁর জন্মভূমি রূপে নির্বাচিত করেছেন। এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তাঁর লালন-পালন হয়েছে, যিনি ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকালেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফলে সেখানকার উলামায়ে হাক্কানীর নিকট-সান্নিধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের প্রাথমিক যুগের মহান বুযুর্গগণের একজন জীবন্ত স্মৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যু কাল পর্যন্ত দারুল উলূমের পরিবেশেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারুল উলূমের হেফজ বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে। অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত দরসে- নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচী এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট সমাপ্ত করার সৌভাগ্য হয়, যাঁদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত আরব আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উস্তাদ শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কোন কোন সময় তাঁর বুখারী শরীফের দরসে বসে বরকত হাসিল করারও সুযোগ লাভ করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর পবিত্র হাতেই সর্বপ্রথম বায়'আত হওয়ারও ভাগ্য হয়। আরবী ইলমের বিভিন্ন বিষয় যে সব যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র), আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান, আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (র), শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র), শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্হ হযরত মাওলানা এজাব আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম ও হযরত আল্লামা রসূল খান সাহেব (র)।

দারুল উলূমের মহান উস্তাদগণের স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধমের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া অবস্থাতেই মুরুব্বীগণ দারুল উলুমের দু'একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর জামা'আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। হিজরী ১৩৪৯ সনে আমাকে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস এবং তফসীরের দু'একটা কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়। অবশেষে ১৩৬২ হিজরীতে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে দারুল উলূমের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হয়। দারুল উলূমে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার কাজও শুরু হয়েছিল। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী

থানবী (র)-র খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ হযরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

হযরত থানবী (র)- কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ইলমে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তফসীর এবং তাসাউফ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তফসীরে বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক তাঁর রচনা 'আত্-তাকাল্লুফ' এবং 'আত্-তামাররুফ' প্রভৃতি কয়েকটা মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শেষ জীবনে হযরত থানবী (র) পবিত্র কোরআনের আলোকে আধুনিক সমস্যাদির সমাধান সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজটি দ্রুত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই কয়েকজনের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। এর এক অংশের দায়িত্ব আমার উপরও অর্পণ করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'আহকামুল কোরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমার উপর ন্যস্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হযরত থানবী (র)-র জীবিতকালেই সমাপ্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে 'মা'আরেফুল কোরআন' রচনার ভিত্তিভূমি সেখান থেকেই রচিত হয়। কারণ হযরত থানবী (র)-র নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রুচি এবং পদ্ধতি আয়ত্ত হয়েছিল, তারই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে।

হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে হযরত থানবী (র)-র জীবদ্দশায় প্রদত্ত ইঙ্গিত এবং বর্তমান মুরুব্বীগণের নির্দেশের আলোকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উস্তাদ, মুরুব্বী ও ফুফাতো ভাই শায়খুল - ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরীর প্রয়োজনে আমাকে জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সম্ভবত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানরূপে গ্রহণ করতে হয়।

যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ

স্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্ধ স্বার্থ চিন্তা এবং আদর্শহীনতার কারণে সে স্বপ্ন একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও ওলামায়ে-কিরাম মুসলিম জনগণের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও ত্যাগ করেননি। একই উদ্দেশ্যে এই অধমও করাচীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক দরস শুরু করে। দীর্ঘ সাত বছর এ দরস সমাপ্ত হয়।

এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে 'মা'আরেফুল কোরআন' নামে একটা ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলি ছিল বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌র রহমতে ধারাবাহিক এ কথিকাগুলি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের বাইরে বসবাসরত উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে ক্রমাগত পত্র আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা শুরু করতে হয়। ১৩৯০ হিজরী নাগাদ এর তেরোটি পারা লেখা সমাপ্ত হয়। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সূরা ইবরাহীম থেকে সূরা নহল পর্যন্ত দুটি পারার তফসীর সমাপ্ত হয়ে মূল কোরআনের অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়ায় হিম্মত অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সুদীর্ঘ রোগভোগ, বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করেই আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে ১৩৯২ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' লেখার কাজ সমাপ্ত হলো। ঘটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ তারিখেই আমার বয়সের সাতাত্তরটা মনযিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, রোগে-ক্লান্তিতে আসন্ন হয়ে গেলে আমার পরম স্নেহাস্পদ সন্তান মৌলভী তকী উসমানী 'মাআরেফ' লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক সময় আমি বলে গিয়েছি, সে লিখেছে। আবার কখনও বা সে লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা পাণ্ডুলিপির সাথে শামিল করেছি। আল্লাহ্ পাক তার ইলম এবং ওমরে বরকত দান করুন।

'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ হিজরীর ৯ ও ১০ ই শওয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হযরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। করাচীর চৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূমে লক্ষাধিক লোক তাঁর জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হয়। জানাযা পড়ান হযরত থানবী (র)-র অন্যতম খলীফা আরেফ বিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেব। দারুল-উলূমের মসজিদ সংলগ্ন সংরক্ষিত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ٥

ওহীর তাৎপর্য

কোরআন করীম যেহেতু 'ওহী'র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চর্চার আগে ওহী সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কর্তব্য।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তার কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইল্‌ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুনিচয়ের কোন্‌টির মধ্যে কি গুণ নিহিত রয়েছে, আর কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুস্থ জ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তুজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

অপরদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কোন্‌টি, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং কোন্‌গুলো অপছন্দ, সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার অবলম্বনস্বরূপ মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা জ্ঞান এবং তৃতীয়টি ওহী।

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে। বোধির মাধ্যমেও সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কিংবা

বোধিরও আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উর্ধ্ব জগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে।

'ইল্‌ম' বা জ্ঞানের উপরিউক্ত তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। প্রতিটিরই আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার বাইরে এর কার্যকারিতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির রং সাদা। কিন্তু চোখে না দেখে আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে সহজ হয় না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির সৃষ্টি, না কোন কারিগরের তৈরী। বলা বাহুল্য, বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।

মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হয়। বুদ্ধির কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে বুদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে অসন্তুষ্ট হবেন। তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দান করার জন্যই আল্লাহ্ **তায়ালা আম্বিয়া কিরামকে** ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান কিছু সংখ্যক মনোনীত বান্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই 'নবী-রসূল' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারগ।

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা মানুষকে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হেদায়েতের জন্য ওহীর ইল্‌ম অপরিহার্য।

বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এর পর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু

হয়, সেজন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, যে কোন একটি বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির প্রয়োগ কার্যকর নয়; তেমনি দ্বীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়।

যদি কোন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ উত্থাপন করা অর্থহীন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করা অসম্ভব নয়।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার দুনিয়াতে কোন একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো, এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্নে তা পরিবেশন করেছেন।

যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কি এরূপ ভাবা যায় যে, তিনি তাঁর কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা পত্র-যোগে তার কি কর্তব্য, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না! যদি একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ আশা করা না যায়, তবে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভিতর পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনামা, জীবনপথে চলার মত সঠিক হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেন নি।

আল্লাহ্ তা'আলার মহাপ্রাজ্ঞ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জন্য হেদায়েতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন নি—বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান বাতলানোর উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত পন্থা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই নিয়মিত পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী

ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে, যা অস্বীকার করা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

হুযুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত এসে সমাপ্তি লাভ করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হয়নি—হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাযিল হতো। সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে-হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে ? হুযুর (সা) জবাব দিলেন ঃ কোন কোন সময় আমি ঘন্টার আওয়াযের মত শুনি। ওহী নাযিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াযের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাযির হন। (বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২)

এ হাদীসে ওহীর আওয়াযকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘন্টার আওয়াযের সাথে তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়ায অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াযকে হুযুর (সা) ঘন্টার অবিরাম আওয়াযের মতো বলে বর্ণনা করেছেন।

বিরতিহীনভাবে ঘন্টা যখন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়ায কোন্ দিক থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি আওয়ায ভেসে আসছে! ওহীর আওয়ায কেমন অনুভূত হতো—একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াযকে ঘন্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফয়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯, ২০)

আওয়ায সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি হুযুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও হুযুর (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উঠতো, পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনা খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাক্ত হতো যে, মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকতো।—(আল্-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হতো যে, হুযুর (সা) কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ হয়ে মাটিতে বসে পড়তো।

একবার হুযুর (সা) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত যায়েদ বলেন, তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তাঁর উরুর হাড় বোধ হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯)

এ পদ্ধতিতে নাযিল হওয়া ওহীর হালকা মৃদু আওয়ায কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌঁছতো। হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুণ গুণ শব্দ শোনা যেতো। (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২)

ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল—ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-র আকৃতিতে দেখা যেতো। কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের অকৃতি ধারণ করেও আসতেন।

মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি এরশাদ করেছেন। (আল্-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহ্র রাসূল (সা) হযরত জিবরাঈলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুওয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা সহী সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত। (ফতহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮ ও ১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ মর্যাদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাত্রিতে লাভ করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখা না দিয়ে হুযুর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে "নাফছ ফির-রূহ" বলা হয়। (এতক্বান; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩)।

কোরআন নাযিলের ইতিহাস

কোরআন করীম আল্লাহ্‌র কালাম। তাই সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা লওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে। খোদ কোরআনের এরশাদঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "বরং তা (সেই) কোরআন (যা) লওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে।" অতঃপর দুই পর্যায়ে কোরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল-ইযযতে' নাযিল করা হয়। 'বাইতুল-ইযযত' যাকে বাইতুল-মা'মূরও বলা হয়, এটি কা'বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের এবাদতগাহ। এখানে পবিত্র কোরআন এক সাথে লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কোরআন নাযিলের এ দু'টি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দেস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)

কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ (রা) বলেন, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে।

শায়খ যুরকানী (রহ) জন্য আর-একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,—এভাবে দুইবারে নাযিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। তদুপরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দুজায়গায় ইহা সুরক্ষিত রয়েছে,—একটি লওহে-মাহ্‌ফুয এবং অন্যটি বাইতুল-মা'মূর। (মানাহেলুল ইরফান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সহীহ্‌ বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, এ অবতারণ শুরু হয়েছিল লাইলাতুল-ক্বদরে ; রমযান মাসের সেই তারিখে, যে তারিখে হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে রাত্রিটি রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কারো মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান এবং কারো মতে সাতাইশে রমযানের রাত্রি। (ইবনে জরীর)

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়, সেগুলো ছিল সূরায়ে-আলাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত।

সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এর পর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন—اِقْرَأْ 'ইকরা' (পড়ুন)।

হুযুর (সা) জবাব দেন ঃ আমি পড়তে জানি না।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হুযুর (সা) বলেন ঃ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'পড়ুন।' আমি এবারও বলি, আমি পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।' এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি পড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণ-ভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি।

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ... ۝

"পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।"

এ'ই ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এর পর তিন বৎসরকাল ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়টুকুকে "ফাতরাতুল-ওহী"-র কাল বলা হয়।

তিন বছর পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো।

মক্কী ও মদনী আয়াত

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সূরাগুলোর উপরে কোন

কোনটিতে 'মক্কী' এবং কোন কোনটিতে 'মদনী' লেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা জরুরী।

মুফাস্‌সিরগণের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত নাযিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত হলো যেগুলো মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে।

কোন কোন লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মদনী বলতে যেগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত কিংবা মি'রাজের সফরে নাযিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মদনী। হিজরতের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলা হয়। এমন কি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়।

কোরআন শরীফের আয়াত ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا -

খাস মক্কা শহরেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু হিজরতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এই আয়াতও মদনী। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)

কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কী, যেমন, সূরা মুদ্দাসসির অপরদিকে কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা হয়ত মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে দু' একটি মদনী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সূরার মধ্যে দু' একটা মক্কী আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, সূরা আ'রাফ মক্কী কিন্তু এ সূরার ঃ

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

থেকে শুরু করে وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত মদনী।

অনুরূপ সূরায়ে হজ্জ মদনী; কিন্তু এ সূরার মধ্যেই وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

عَذَابَ يَوْمٍ عَقِيمٍ থেকে শুরু করে مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى পর্যন্ত চারটি আয়াত মক্কী অর্থাৎ হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সূরাকে মক্কী বা মদনী গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সূরাকে মক্কী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সূরাকে মদনী গণ্য করা হয়েছে।

যেসব সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট আয়াত হিজরত-পরবর্তী সময়ে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সূরা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। (মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২)

মক্কী ও মদনী আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য

ইলমে-তফসীরের বিশেষজ্ঞগণ মক্কী ও মদনী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সূরাটি মক্কী না মদনী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন যে, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে, এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরাগুলো মক্কী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী না মদনী হওয়ার।

মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) যেসব সূরায় كَلَّا শব্দ অর্থাৎ 'কখনই নয়' ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী। এ শব্দটি বিভিন্ন সূরায় তেত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সূরা কোরআনুল করীমের শেষার্ধে রয়েছে।

(২) যেসব সূরায় (হানাফী মযহাব মতে) সেজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী।

(৩) সূরা বাক্বারাহ্ ব্যতীত যেসব সূরায় আদম (আ) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

(৪) যেসব সূরায় জেহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মদনী।

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও হয়ে থাকে।

(১) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণত يَا اَيُّهَا النَّاس অর্থাৎ 'হে মানব

সন্তানগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরায় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) মক্কী আয়াত সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত। অপরপক্ষে মদনী সূরা ও আয়াত সাধারণত দীর্ঘ ও বিশ্লেষাত্মক।

(৩) মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সপ্রমাণ করা, হাশর ও শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিবৃত হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী আয়াতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, জেহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাধারণত মুশরিক ও মূর্তিপূজক-দের দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর মধ্যে আহ্‌লে-কিতাব ও মুনাফিক-দের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

(৫) মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এসব সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দসম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য।

মক্কী ও মদনী সূরার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হয়েছে সাধারণত সমাজ-পরিবেশ, যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের রুচির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করে। মক্কার জীবনে মুসলমানদের মোকাবেলা ছিল যেহেতু আরবের মূর্তিপূজক মুশরিকদের সাথে এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি সেজন্য তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে সাধারণত প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সংস্কার, চরিত্র সংশোধন, মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ এবং কোরআন করীমের অনন্য বর্ণনাভঙ্গীর মোকাবেলায় ভাষাজ্ঞানের গর্বে গর্বিত আরব সমাজকে নির্বাক করে দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যই অত্যন্ত আবেগময় বর্ণনাভঙ্গীর অবতারণা করা হয়েছিল। অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোক দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। শিরক ও মূর্তিপূজার অসারতা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি আদর্শের ক্ষেত্রে সকল মোকাবেলা ছিল আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে, সেজন্য এই সময়কার আয়াতগুলোতে আইন-কানুন, নিয়মনীতি ও আহ্‌লে-কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রেও যুক্তিপূর্ণ সরল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

কোরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হলো কেন

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনুল করীম একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে

ধীরে ধীরে তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন হয়েছে, তা ছিল সূরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আন্'আম একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআন শরীফকে একবারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাযিল করা হলো, এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ○

অর্থাৎ "এবং কাফেররা বলে, কোরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো না ? এইভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।"

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী কোরআন শরীফ পর্যায়-ক্রমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন ঃ

(১) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তাঁর প্রতি তওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো। এতদ্বারা

শরীয়তে-মুহাম্মদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনুসারিগণের গা-সওয়া করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সে সব নির্দেশের উপর আমল করার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো।

(৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তাঁর কওমের তরফ থেকে যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘন ঘন আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সহায়ক হতো।

(৪) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর-দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের অভ্রান্ততার দাবী অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

শানে নযুল প্রসঙ্গে

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাযিল করেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের জওয়াবে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সে সব আয়াতের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়। এসব আয়াতের পশ্চাৎবর্তী সে পটভূমিকেই তফসীরের পরিভাষায় 'শানে-নযুল' বা 'সববে-নযুল' বলা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমনঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ - وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۝

অর্থাৎ "মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মুমিন বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।"

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে 'এনাক' নাম্নী এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় চলে যান, কিন্তু এনাক মক্কাতেই থেকে যান। একবার কোন কাজ উপলক্ষে

হযরত মারসাদ (রা) মক্কায় আগমন করলে এনাক তাঁকে পূর্ব আসক্তির ভিত্তিতে তাঁর সাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি।

মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (আসবাবুন নুযুল, ওয়াহেদী, পৃষ্ঠা ৩৮)

উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নযুল বা আসবাবে-নযুল। তফসীরের ক্ষেত্রে শানে-নযুল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাযিল হওয়ার পটভূমি বা শানে-নযুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার করা দুষ্কর।

সাত হরফ বা সাত ক্বেরাআত প্রসঙ্গ

উম্মতের সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের কিছু সংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেনঃ আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে; আমার উম্মতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

জওয়াব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহ্ পাক আপনাকে হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাঈল (আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করুন না কেন, তার তেলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে।

(মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)

এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ০

অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তেলাওয়াত কর। (বোখারী)

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত 'সাত হরফ'-এর অর্থ কি—এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্ত্বদর্শী আলেমগণের নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফ যে ক্বেরাআতের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত রকম হতে পারে। অনুমোদিত সে সাতটি ধরন নিম্নে লিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব ঃ

(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন এক ক্বেরাআতে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ এ আয়াতে 'কালেমাতু' শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য ক্বেরাআতে শব্দটি বহুবচনে উচ্চারিত হয়ে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ পঠিত হয়েছে।

(২) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত ক্বেরাআতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য ক্বেরাআতে رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

(৩) রীতি অনুসারে এরাব চিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে ক্বেরাআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন,—وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ এর স্থলে কেউ কেউ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ পাঠ করেছেন।

অনুরূপ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ পাঠ করেছেন।

(৪) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের কম-বেশীও হয়েছে। যেমন,—تَجْرِىْ مِنْ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ এর স্থলে কেউ কেউ مِنْ শব্দ বাদ দিয়ে الْاَنْهَارُ পাঠ করেছেন।

(৫) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন—এক ক্বেরাআতে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ এসেছে। এখানে ক্বেরাআতের পার্থক্যে 'হাক্ব' ও 'মাউত' (শব্দ দু'টি) আগে-পিছে হয়ে গেছে।

(৬) শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক ক্বেরাআতে এক শব্দ এবং অন্য ক্বেরাআতে তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন—نُنْشِزُهَا এর স্থলে অন্য ক্বেরাআতে نَنْشُزُهَا পঠিত হয়েছে। فَتَبَيَّنُوْا এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং طَلْحٍ এর স্থলে طَلْعٍ ও পঠিত হয়েছে।

(৭) উচ্চারণ পার্থক্য; যেমন কোন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লম্বা, খাটো, হালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। যেমন مُوْسٰى শব্দটি কোন কোন ক্বেরাআতে مُوْسِىْ রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা, উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত ক্বেরাআতের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় কোরআনের উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আয়াতের উচ্চারণভঙ্গীতে

সুবিধামত পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত করতেন। একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা শুনতেন। এভাবে শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতিও সুনিশ্চিত হতো। শেষ বিদায়ের বছর রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খতম সম্পন্ন হয়েছিল। এ খতমকেই ক্বারীগণের পরিভাষায় عرضة اخيرة বা 'শেষ-দাওর' বলা হয়। এ উপলক্ষে তেলাওয়াত-পদ্ধতির শুদ্ধতম পন্থাগুলো বলে দিয়ে অন্যান্য সকল পঠন-পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুধুমাত্র ঐ সব ক্বেরাআতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি ক্বেরাআতই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও পর্যন্ত আরবী লেখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ যের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন। যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের আলেম-ক্বারী ও হাফেযগণ ক্বেরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত ক্বেরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। সাধক আলেম-হাফেজ-ক্বারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ক্বেরাআত-পদ্ধতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর লিপিবদ্ধকৃত সাত ক্বেরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্বেরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্বারীও প্রেরণ করতেন। সেসব ক্বারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অনুলিপির অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্বেরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ অনুমোদিত ক্বেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এ সব শিক্ষক-সাহাবীর কাছ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের 'অনেকেই ইলমে-ক্বেরাআত' চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াক্‌ফ করে দেন। এভাবেই 'ইলমে-ক্বেরাআত' একটা স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গড়ে ওঠে। প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক 'ইলমে-ক্বেরাআতে' অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইলমের ইমামগণের শরণাপন্ন হতে থাকেন। কেউ কেউ আবার দুই-তিন বা সাত ক্বেরাআতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আগ্রহ ও সাধনার ফলে 'ইলমে-ক্বেরাআতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি এমন কি ধ্বনিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত

এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী কর্তৃক সমভাবে সমর্থিত ও অনুসৃত হতে থাকে।

ক্বেরাআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন-পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্বেরাআত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিন. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইলমে ক্বেরাআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে পরিচিত হতে হবে।

কোন ক্বেরাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন-পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই গণ্য হবে না।

ক্বেরাআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্বারীর ক্বেরাআত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ-প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে ইলমে ক্বেরাআতের শুদ্ধতম পদ্ধতি-গুলো যুগ পরম্পরায় চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থিগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির ক্বেরাআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের ক্বেরাআতই আয়ত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই ক্বেরাআত সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলেমগণ ক্বেরাআত-পদ্ধতিগুলোর খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবু হাতেম সাজেস্তানী, কাজী ইসমায়ীল ও ইমাম আবু জাফর তাবারী এই ইল্‌ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হিঃ) একটি প্রামাণিক কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবু বকর কর্তৃক উল্লিখিত সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিই শুদ্ধ তম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইমাম ইবনুল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন ক্বারীর ক্বেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন নি যে, এই সাতজনের ক্বেরাআতই শুদ্ধতম—এরূপ দাবীও তিনি কোথাও করেন নি।

ইমাম ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এই হয়েছে যে, হাদীস শরীফে উল্লিখিত 'ছাবআতা-আহরূফ' বা সাত হরফের যে বর্ণনা রয়েছে তা বোধ হয় এ সাতজন ক্বারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্য নয়। কেননা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাঠিতে যে সব পঠন-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই সাত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সাত ক্বারী

ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন ক্বারী সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. **আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদদারী** (র) (ওফাত ১২০ হিঃ) ঃ ইনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত মক্কা শরীফে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বাযযী (র) ও হযরত কান্‌বাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন।

২. **নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবু নায়ীম** (ওফাত ১৬৯ হিঃ) ঃ ইনি এমন সত্তর জন তাবেয়ী থেকে ইলমে-ক্বেরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু মূসা কালুন (ওফাত ২২০ হিঃ) ও আবু সায়ীদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

৩. **আবদুল্লাহিল হিসবী** (ওফাত ১১৮ হিঃ) ঃ ইবনে 'আমের নামে খ্যাত। ইনি সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা বিন আসকার (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইল্‌মে ক্বেরাআত হযরত মুগীরা বিন শেহাব মাখযুমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা বিন শেহাব হযরত ওসমান (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআতের বেশী প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারি-গণের মধ্যে হেশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪. **আবু আ'মার যাব্বান ইবনুল-আলা** (ওফাত ১৫৪ হিঃ) ঃ ইনি হযরত মুজাহিদ (রা) ও সায়ীদ ইবনুল জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত উবাই ইবনুল কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত বসরায় বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হিঃ) ও আবু শোয়াইব সূমীর (ওফাত ২৬১ হিঃ) খ্যাতি সমধিক।

৫. **হামযা বিন হাবীব আয-যাইয়্যাত** (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ঃ ইনি ইকরামা বিন রবী আত্-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ-এর সাগরেদ।

সুলায়মান বিন ওয়াস্‌সাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহ্‌ইয়া তিনি হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে খালফ বিন হেশাম (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ও খাল্লাদ বিন খালেদ (ওফাত ২২০ হিঃ) বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৬. **আসেম বিন্ আবিন্‌নাজুদ আল্-আসাদী** (ওফাত ১২৭ হিঃ) ঃ ইনি যর বিন হোবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) আবু আবদুর রহমান ছুলমার মাধ্যমে হযরত আলী (রা)-এর সাগরেদ। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে শা'বা বিন্ আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হিঃ) ও হাফস্ বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফস বিন সুলায়মানের বর্ণিত ক্বেরাআত-পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত।

৭. **আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল্-কাসায়ী** (ওফাত ১৮৯ হিঃ) ঃ ইনি আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবুল হারেস মারওয়াযী (ওফাত ২৪০ হিঃ) ও আবু উমারুদ দাওরী সমধিক প্রসিদ্ধ।

শেষোক্ত তিন জনের ক্বেরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজন ছাড়া আরো কয়েকটি ক্বেরাআত পদ্ধতি বহুল-বর্ণিত বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে যখন সাধারণের মধ্যে এরূপ একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতি উপরিউক্ত সাত ক্বেরাআতেই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলেমগণের অনেকেই, বিশেষত, আল্লামা শাযায়ী ও আবু বকর মেহরান সাতের স্থলে দশটি ক্বেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের পুস্তকে পূর্বোল্লিখিত সাতজন ছাড়া আর যে তিন জনের ক্বেরাআত উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. **ইয়াকুত বিন ইসহাক হাযরামী** (ওফাত ২০৫ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআত বসরা এলাকায় বেশী প্রচলিত হয়েছিল।

২. **খালফ বিন হিশাম** (ওফাত ২০৫ হিঃ) ঃ ইনি হামযার ক্বেরাআতের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত কুফায় বেশী বিস্তার লাভ করেছে।

৩. **আবু জাফর ইয়াযীদ বিন কা'কা'** (ওফাত ১৩০ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে সর্বাধিক প্রচলিত হয়।

পরবর্তীকালে কোন কোন গ্রন্থকার চৌদ্দ জন ক্বারীর ক্বেরাআত উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত দশজন ছাড়াও তাঁরা নিম্নোক্ত চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

১. **হযরত হাসান বস্‌রী (র)** (ওফাত ১১০ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের চর্চা বসরাতে বেশী হয়েছে।

২. **মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মাহীয** (ওফাত ১২৩ হিঃ) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের কেন্দ্র ছিল মক্কা শরীফ।

৩. **ইয়াহ্ইয়া বিন মোবারক ইয়াযীদী** (ওফাত ২০২ হিঃ) ঃ ইনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।

৪. **আবুল ফারজ শিনবুযী** (ওফাত ৩৮৮ হিঃ) ঃ ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।

কেউ কেউ চৌদ্দজন ক্বারীর তালিকায় হযরত শিনবুযীর স্থলে সুলায়মান আ'মাশ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত চৌদ্দটি ক্বেরাআতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত। পরবর্তী চার জনের ক্বেরাআত বিরল বর্ণনাভিত্তিক—(মানাহেলুল-ইরফান, মুনজেদুল-মোকাররেঈন—ইবনুল জাযারী)।

কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

রাসূল (সা)-এর আমলে

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন-মত অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুওয়ত যুগে কোরআনকে গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রথম প্রথম কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফয বা কন্ঠস্থ করার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ক্বেয়ামায় আয়াত নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ্ পাক তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কোরআন কন্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাযিল হতে থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিনা কোরআনুল-করীমের এমন সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ-বিয়োগ কিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি সে পর্যন্ত নাযিলকৃত সমগ্র কোরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনে নিতেন। ওফাতের বছর রমযানে হুযুর দু'দুবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শোনেন। (বোখারী শরীফ)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের আয়াতগুলো ইয়াদ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যেও কোরআন মুখস্থ করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। অনেক মহিলা পর্যন্ত বিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ দাবী পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কোরআন শরীফের তা'লীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধুমাত্র কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার সাধনাতেই জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোরআন শরীফ শুধুমাত্র মুখস্থই করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই তাকে কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কোরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তেলাওয়াতের মধ্যে টক্কর না হয়। (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফেযে-কোরআন তৈরী হয়ে গেলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাফায়ে-রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সা'আদ (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা), হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত আবু হোরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আমর ইবনুল-আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে-সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হেফয-এর প্রতিই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পুস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এপং অন্য কোন উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রখর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা গাঁথা মুখস্থ করে রাখত। মরুভূমির বেদুঈনেরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কুষ্ঠিনামার ইতিহাস প্রভৃতি মুখস্থ করে রাখত এবং যত্রতত্র তা অনর্গল বলে যেতো। কোরআন হেফাযতের কাজে সেই অনন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। হেফযের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোরআন পাক হেফয করানোর পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেনঃ আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখন উপযোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর কোরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙে পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি!

লেখা শেষ হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা শুদ্ধ করিয়ে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করতেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬ ; তিবরানী)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছাড়াও যাঁরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮ ; যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮)

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এজন্য কোরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত লেখন সামগ্রীর সমষ্টিরূপে রক্ষিত হয়েছিল। নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত

ছিল। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির হাতে কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতসম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিখিত কোরআন শরীফের নোসখা একত্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে সংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগেই অনুভূত হয়। সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্র করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত কোরআন পাককে একত্রে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

কি কারণে হযরত আবু বকর (রা) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরী করে সংরক্ষিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশী করে অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন হযরত আবু বকর (রা) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, হযরত ওমর (রা) সেখানে রয়েছেন। আমাকে দেখে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ হযরত ওমর (রা) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে-কোরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেয সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কোরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন।

আমি হযরত ওমর (রা)-কে বলেছি যে, যে কাজ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা।

হযরত ওমর (রা) জবাব দিয়েছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ হবে খুবই উত্তম। একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক; তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কোরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখতে শুরু কর।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু কঠিন বলে মনে হত না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ

খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোক-জনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম। (সহীহ্ বোখারী, কিতাবু ফাযায়েলিল কোরআন)

প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন করার ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেযে-কোরআন ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তা'ছাড়া শত শত হাফেয বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একত্র করেও সমগ্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল, বিশেষত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরী হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেযের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্‌খা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। যেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ (রা)-এর নিকট হাযির করা হল, সেগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন ঃ

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন।

২. হযরত ওমর (রা)-ও হাফেযে কোরআন ছিলেন। হযবত আবু বকর তাঁকেও হযরত যায়েদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন। (ফতহুল বারী, আবু দাউদ)

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। (ইতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০)

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।—(আল-বেরহানা, ফী উলুমিল-কোরআন, যারাকশী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮)

হযরত আবু বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবলম্বিত উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কথাটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সূরা বারাআত-এর শেষ আয়াত—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি শুধু হযরত আবু খুযায়মা (রা)-র কাছে পাওয়া যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হযরত আবু খুযায়মা (রা)-ই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিল না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানের লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরিউক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবলমাত্র আবু খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাফেজের স্মৃতিতে ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের নোস্‌খায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত এ আয়াত আবু খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। (আল্ বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৫)

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেইটি অনেকগুলো 'সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. আয়াতগুলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল। (আল্-এতক্বান)

২. এ নোস্‌খায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্বেরাআতই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। (মানাহেলুল-এরফান, তারীখুল-কোরআন,—কুর্দী)

৩. যে সব আয়াতের তেলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪. নোস্‌খাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উম্মতের সবাই এইটি থেকে নিজ নিজ নোস্‌খা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোস্‌খাটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি হযরত ওমর (রা) নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাহাদতের পর নোস্‌খাটি উম্মুল-মু'মেনীন হযরত হাফসা (রা)-র কাছে রক্ষিত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক সূরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ

কোরআনের সর্বসম্মত শুদ্ধতম নোস্‌খা প্রস্তুত হয়ে চারদিকে বিতরিত হওয়ার পর হযরত হাফসা (রা)-র নিকট রক্ষিত নোস্‌খাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সূরার তরতীববিহীন কোন নোস্‌খা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশংকা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬)

হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে

হযরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দওলত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা করতেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ সাত হরফ বা ক্বেরাআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বিভিন্ন ক্বেরাআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক সাহাবীই যে ক্বেরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্বেরাআতেই স্ব স্ব সাগরেদগণকে কোরআন শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এ ভাবেই বিভিন্ন ক্বেরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত ক্বেরাআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্বেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্বেরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ এমন কি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্বেরাআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের ক্বেরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, ক্বেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) কর্তৃক লিখিত নোস্‌খা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোস্‌খা ছিল না, যা অভ্রান্ত দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা অন্য যেসব নোস্‌খা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লেখন পদ্ধতিতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা ছিল এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্বেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোস্‌খা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হযরত ওসমান (রা) তাঁর খেলাফতের যমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান এলাকায় জেহাদে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ আমীরুল মু'মেনীন ! এ উম্মত আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

হযরত ওসমান (রা) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ আমি আর্মেনিয়া এলাকায় জেহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন তেলাওয়াত করছে। অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্বেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাআত-পদ্ধতি শোনার সুযোগ হয়নি। ফলে এঁদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরত ওসমান (রা) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশংকা করছিলেন। খোদ মদীনা শরীফেও বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাগরেদগণের মধ্যে ক্বেরাআতের পার্থক্যকে ভিত্তি করে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ মতবিরোধের উত্তাপ ওস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমন কি তাঁরাও একে অপরের ক্বেরাআতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান (রা) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের ক্বেরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? হযরত ওসমান (রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত নোস্খা তৈরী করা কর্তব্য, যাতে ক্বেরাআত-পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হযরত ওসমান (রা) সর্বশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা

দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বোঝা যায় যে, যাঁরা আমার থেকে দূর থেকে দূরতর এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আরো বেশী মতভেদ এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে মিলে কোরআন শরীফের এমন একটা লিখিত নোস্‌খা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) সর্ব প্রথম উম্মুল-মু'মেনীন হযরত হাফসা (রা)-র কাছ থেকে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'মাস্‌হাফগুলো' চেয়ে আনলেন। এ মাস-হাফ সামনে রেখে সূরার তরতীবসহ কোরআনের শুদ্ধতম 'মাসহাফ' তৈরী করার উদ্দেশ্যে কোরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, হযরত সায়ীদ ইবনুল-আস ও হযরত আবদুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত মাস্‌হাফকেই শুধুমাত্র এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তেলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ছিলেন আনসারী (রা) এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হযরত ওসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কোরাইশদের লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ কোরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কোরাইশ ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেক-কেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা কোরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন ঃ

এক. হযরত আবুবকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নোস্‌খাটি তৈরী করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোস্‌খায় লিখিত হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই 'মাসহাফ'-এ সাজিয়ে দেন। (মুস্‌তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯)

দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্‌তা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। (মানাহেলুল-এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪)।

তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র নোস্‌খা মওজুদ ছিল। তাঁরা একাধিক নোস্‌খা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত ওসমান

(রা) পাঁচখানা নোস্‌খা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সাজেস্তানী (রা)-র মতে সাতটি নোস্‌খা তৈরী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্‌খা বিশেষ যত্ন সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল। (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)

চার. লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় লিখিত নোস্‌খা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিল, তন্মধ্যে সূরা আহযাব-এর এ আয়াত ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

শুধুমাত্র হযরত খুযায়মা বিন সাবেত আনসারী (রা)-র নোস্‌খায় লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মাসহাফ তৈরী করার সময় সূরা আহযাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নোস্‌খাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেটি আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ (রা)-সহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল কিংবা এত-দ্বারা একথাও বোঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না। বরং হযরত আবু বকর কর্তৃক তৈরী করা নোস্‌খায় এ আয়াত লিখিত ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্‌খা-গুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্‌খা লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবলমাত্র হযরত খুযায়মা বিন সাবেত (রা)-এর লিখিত নোস্‌খাতে পাওয়া গিয়েছিল।

পাঁচ. কোরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাসহাফ তৈরী হওয়ার পর সমগ্র উম্মত এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল নোস্‌খা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্‌খাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মত প্রতিটি ক্বেরাআতে পাঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

হযরত ওসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহ-

যোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর মন্তব্য, "ওসমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কোরআনের 'মাসহাফ' তৈরীর ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।" (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা

হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক 'মাসহাফ' তৈরীর কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মত ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত ওসমান (রা) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত 'মাসহাফ'ই হযরত ওসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হযরত ওসমান (রা)-এর তৈরী করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরী করেই দুনিয়ার সর্বত্র কোরআন -করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল ওসমানী অনুলিপিতে নোক্‌তা ও যের-যবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনরাবদের পক্ষে এ মাসহাফ-এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 'ওসমানী' অনুলিপিতে নোক্‌তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল ওসমানী 'মাসহাফ'-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নোক্‌তা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্‌তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তুত তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোক্‌তাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তাঁরা বাক্যের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোরআন শরীফের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা এজন্য ছিল না যে, কোরআন তেলওয়াতে মোটেও অনুলিপিনির্ভর ছিল না। হাফেযগণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতেন। হযরত ওসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের 'মাসহাফ' প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনকে মাসহাফের পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

কোরআন -করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্‌তার প্রচলন, কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকরীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী (রা) আনজাম দেন। (আল্‌-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)

অনেকের মতে আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-র নির্দেশে আনজাম দিয়েছিলেন। (সুবহুল-আ'শা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫)।

কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত

হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামা'র (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র)-র দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন। (তফসীরে-কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

হরকত

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদিও ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামার ও নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন। (কুরতুবী, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্র করে বিষয়টি আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, কোরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা এবং যের দিতে হলে নীচে একটা নোক্তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোক্তা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোক্তা ব্যবহার করা হতো। আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে আহমদ (র) হামযা ও তাশ-দীদের চিহ্ন তৈরী করেন। (সুবহুল-আ'শা ৩য় খণ্ড, ১৬০ ও পৃষ্ঠা ১৬১)

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার ও নসর ইবনে আ'সেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হযরত আবুল আস-ওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্থলে বর্তমান আকারের হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

মন্যিল

সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁরা দৈনিক তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হেযব' বা মন্যিল বলা হতো। এ কারণেই কোর-আন শরীফ সাত মন্যিলে বিভক্ত হয়েছে। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)।

পারা

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এ খণ্ডগুলোকে 'পারা' বলে অভিহিত করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা হযরত ওসমান (রা) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন এ

ধরনের ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা থেকেই ত্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র) লেখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু আগে থেকেই চলে আসছে বিশেষত মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশী চলে আসছে। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০; মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে-কেরামের যুগের পর শিক্ষাদান কার্যে সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

আখমাস ও আশার

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোসখায় আরো দুটি আলামত দেখা যেত। প্রতি পাঁচ আয়াতের পর পাতার পাশে خمس অথবা সংক্ষেপে শুধু خ হরফটি লেখা থাকত। অনুরূপ দশ আয়াতের পর عشر অথবা ع সংক্ষেপে লিখিত হতো। প্রথম চিহ্নটিকে 'আখমাস' এবং পরবর্তী চিহ্নটিকে আ'শার বলা হতো। (মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩)

কোরআন শরীফে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয এবং অনেকেই মকরূহ বলেছেন। সঠিকভাবে একথা বলাও মুশকিল যে, সর্বপ্রথম এ আলামতের প্রচলন কে করেছিলেন। কারো কারো মতে এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের খলীফা মামুন এ চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১)

কিন্তু উপরিউক্ত দু'টি অভিমতই এজন্য শুদ্ধ বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেও আখমাস ও আ'শার-এর চিহ্ন পাওয়া যায়। হযরত মসরুক-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) মাসহাফের মধ্যে আ'শার-এর চিহ্ন সংযোজন করা মকরূহ মনে করতেন। (ইবনে আবি শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩)।

রুকু

'আখমাস' ও 'আ'শার'-এর আলামত পরবর্তী পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়ে অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত এ চিহ্নটিকে রুকু বলা হয়। এ চিহ্নটি আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রুকুর চিহ্নস্বরূপ একটা ع অক্ষর অংকিত করা হয়।

এ চিহ্নটি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে, অনেক তালাশ করেও এ সম্পর্কিত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হইনি। তবে বোঝা যায় যে, এ চিহ্ন দ্বারা আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাআতে পঠিত হতে পারে। নামাযে এতটুকু তেলাওয়াত করে রুকু করা যেতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রুকু বলা হয়।

সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি রুকূ রয়েছে। যদি তারাবীহ্‌র নামাযে প্রতি রাকআতে এক রুকূ করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়। (ফতাওয়ায়ে-আলমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, তারাবীহ অধ্যায়)

কয়েকটি যতিচিহ্ন

শুদ্ধ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের যতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন্ জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহ্নগুলোকে পরিভাষায় 'রুমূযে-আওক্বাফ' বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না-জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে; কোন্‌খানে থামলে পর অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (আন্-নশ্‌রু ফী ক্বেরা'আতিল-আশ্‌র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫)

চিহ্নগুলো নিম্নরূপ ঃ

ط = 'ওয়াকফ মতলক্ব' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে থামাটাই উত্তম।

ج = 'ওয়াকফ-জায়েয' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে।

ز = 'ওয়াকফ-মুজাওয়ায'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই উত্তম।

ص = 'ওয়াকফ-মুরাখ্‌খাছ'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি! তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই থামা উচিত। (আল-মানুহুল-ফিকরিয়্যা, পৃষ্ঠা ৬৩)

م = 'ওয়াকফ-লাযেম'-এর সংক্ষেপ। অর্থ যদি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামাই উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে-ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ এ নয় যে, এখানে না থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতগুলো যতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম। (আন্-নশ্‌র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

لا = 'লা তা'কেফ' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই নাজায়েয, তা নয়। বরং এ চিহ্ন-বিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে থামা মোটেও দূষণীয় নয় এবং এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। (আন-নশর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩)

উপরিউক্ত যতিচিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আল্লামা

সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

ع = 'মোয়ানাকা' শব্দের সংক্ষেপ। যে আয়াতে দু'ধরনের তফসীর হতে পারে, সেরূপ স্থানে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বোঝায়। সুতরাং দু'জায়গার যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতেও থামা জায়েয হবে না। যেমন—

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ - وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ - كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ..... -

এ আয়াতে যদি তওরাত শব্দের মধ্যে ওয়াক্ফ করা হয়, তবে 'ইনজীল' শব্দের ওয়াক্ফ করা জায়েয হবে না। অপরপক্ষে, যদি ইনজীল শব্দে এসে থামতে হয়, তবে আগের তওরাত শব্দে থামা জায়েয হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, তবে তাতেও কোন দোষ হবে না। চিহ্নটির আর এক নাম মোকাবিলাও ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্নটি ইমাম আবুল-ফযল রাযী (র) প্রচলন করেছেন। (আন-নশর, পৃষ্ঠা ২৩৭ ; আল্-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)

سكتة—চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বুঝবার অবকাশ রয়েছে—এ ধরনের জায়গায় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

وقفة—এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সেক্তার চাইতে একটু বেশী সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق—কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

قف—অর্থ, এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তেলাওয়াতকারীর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না।

صلے—'আল-ওয়াসলু আওলা' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাপর দু'টি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

صل—ক্বাদ্‌য়ূসালু—বাক্যের সংক্ষেপ। অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم—"বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তেলাওয়াত করার সময় এখানে থেমেছিলেন।

কোরআনের মুদ্রণ ঃ মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য কোন নযীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্‌খা মিসরের দারুল-কুতুবে এখনো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোর-আন শরীফ মুদ্রণ করেন। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কোরআন শরীফ মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কোরআন শরীফের আর একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআনের নোস্‌খা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তারীখুল-কোরআন, কুর্দি পৃষ্ঠা ১৮৬; ডক্টর ছাবহী ছালেহ্‌ লিখিত গ্রন্থের গোলাম আহমদ হারিরী কৃত উর্দু তরজমা, পৃষ্ঠা ১৪২)

ইল্‌মে তফসির

প্রসঙ্গক্রমে ইল্‌মে-তফসীর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। আরবী ভাষায় 'তফসীর' অর্থ উদ্‌ঘাটন করা বা খোলা। পরিভাষায় ইল্‌মে-তফসীর বলতে সেই ইল্‌মকে বোঝায়, যার মধ্যে কোরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান-রহস্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ -

—"আমি আপনার নিকট উপদেশ (গ্রন্থ, কোরআন) এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।"

পবিত্র কোরআনে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এটা বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেন।"

অতএব, মহানবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে শুধু কোরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন না, এর পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের এক একটি সূরা পড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত।

মহানবী (সা)-র জীবদ্দশায় কোন আয়াতের তফসীর অবগত হওয়া কোন সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী (সা)-র শরণাপন্ন হতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন। কিন্তু হযরত (সা)-র তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও যাতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধর্মী পথভ্রষ্টদের পক্ষে এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিকৃতি সাধনের কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইল্‌ম আকারে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলিম মনীষিগণ এ মহান দায়িত্বটি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, আজ কোনরূপ প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই আমরা বলতে পারছি যে, আল্লাহ্র এই শেষ গ্রন্থের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার নির্ভুল তফসীর বা ব্যাখ্যা যা মহানবী (সা) এবং তাঁর সাধক সাহাবীগণের দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাও সুসংরক্ষিত আছে।

মুসলিম জাতি কিভাবে 'ইল্‌মে-তফসীর' সংরক্ষণ করল, এ ক্ষেত্রে তাদের কি পরিমাণ শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেষ্টা-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে, তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে কম। তবে কোরআন তফসীরের ব্যুৎপত্তিস্থল কি কি, 'ইল্‌মে-তফসীর' সম্পর্কে প্রতিটি ভাষায় যে অগণিত গ্রন্থ রয়েছে, ঐগুলোর লেখকগণ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় কোন্ কোন্ উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো কিছুটা বর্ণনা করা যেতে পারে।

ইল্‌মে-তফসীর-এর মূল উৎস মোট ছয়টি ঃ

১. **কোরআন মজীদ ঃ** ইল্‌মে তফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ। কোরআনে এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা

অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরা ফাতিহার দোয়া সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "আমাদেরকে ঐ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।" কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ঐ সকল লোক কারা, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক আয়াতে সেসব ব্যক্তিকে এই মর্মে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ط -

—"তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন নবী-রসূল, সিদ্দীকীন, শহীদ ও সৎ কর্মশীল।"

মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন। যদি কোরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয়।

২. **হাদীস ঃ** মহানবী (সা)-র বক্তব্য এবং কার্যাবলীকে 'হাদীস' বলা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের বাহকরূপে তাঁকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহ্র রাসূল নিজের কথা ও কাজ—উভয় বিষয়েই এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-র গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল্লাহর কিতাবের অর্থ নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে 'সহীহ', 'যয়ীফ' ও 'মওযু' প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছবিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা বৈধ নয়। কারণ হতে পারে, উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের পরিপন্থী। আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক। এ ব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই

হস্তক্ষেপ করতে পারেন, যাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশাস্ত্র আয়ত্তে আনার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন।

৩. **সাহাবীগণের বক্তব্য ঃ** সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী (সা) থেকে সরাসরি কোরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাযিলের যুগে তাঁরা বেঁচেছিলেন। কোরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়। অতএব, যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ ঐকমত্যে পৌঁছুলে মুফাসসিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে হ্যাঁ, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, ঐগুলোর কোন্ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়? এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে 'উসূলে-ফিকাহ্' 'উসূলে-হাদীস' ও 'উসূলে তফসীর'। সে সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত।

৪. **তাবেয়ীনদের বক্তব্য ঃ** এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীনদের। যে সব মহৎ ব্যক্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই 'তাবেয়ী' বলা হয়। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তফসীরশাস্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল্-ইতক্বান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯) তবে তফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি।

৫. **আরবী সাহিত্য ঃ** কোরআন মজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেহেতু কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী। কোরআনে এমন অসংখ্য আয়াত আছে যেগুলোতে শানে-নযূল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সকল আয়াতের তফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

৬. **চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন ঃ** তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি। কোরআন মজীদের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি

অকূল সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করেছেন, সে তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কোরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা বা সাহাবী-তাবেয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তা হলে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সূফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজীদের তফসীরে এ জাতীয় নব-নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কোরআন-সুন্নাহ্-বিশারদ সুপণ্ডিত ওলামায়ে কেরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ ইল্‌মে-তফসীরের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের মৌল-নীতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মূল্য নেই।

ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ

'ইসরাইলিয়াত' বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে ঐ সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর প্রমাণ-সূত্রের গোড়ায় আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান বর্ণনাকারিগণ রয়েছে। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) লিখে দিতেন, যেগুলো সনদ সহকারে তাঁদের কাছে পৌঁছাতো। সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহলে-কিতাবদের বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী। এ জাতীয় বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের সেই আগেকার জ্ঞানসূত্র থেকে প্রধানত এসব বর্ণনা ইল্‌মে-তফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে। কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন। কোরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আহ্‌লে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও উল্লেখ করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্‌সিরগণ 'ইসরাইলিয়াত' নামে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে কাসীর (র) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি 'ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ফেরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মূসা (আ)-র তূর পর্বতে গমন প্রভৃতি।

(২) যে সব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর শেষ বয়সে

(নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছে :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

—"সুলায়মান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হন নি, বরং শয়তানরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।" এমনি ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত দাউদ (আ) তাঁর সেনাপতি 'উরিয়া'-র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এটাও একটা নিছক মিথ্যা অলীক বর্ণনা। এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা জ্ঞান করা অপরিহার্য।

(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ্ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ নীরব। যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী (সা)-র শিক্ষা হলো নীরব থাকা। এগুলোর ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা। অবশ্য এ ব্যাপারে ওলামায়ে-কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা নকল করা বৈধ কিনা। হাফেয ইবনে কাসীরের মতে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। (মোকাদ্দমা-এ ইবনে-কাসীর)

তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও জটিল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। কোরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ওলামায়ে-কেরাম লিখেছেন,—যিনি কুরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হতে হবে :

(১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলঙ্কারশাস্ত্র (৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও (৪) হাদীসশাস্ত্র (৫) ফেকাহশাস্ত্র (৬) তফসীরশাস্ত্র এবং (৭) আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। এ সকল জ্ঞান-শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না।

পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্মক ব্যাধি এমন মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার

সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণেরও ভুলভ্রান্তি বের করতে শুরু করে দেয়। আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে মস্ত বড় আলেম মনে করতে থাকে এবং বড় বড় মুফাস্‌সিরের সমালোচনা করতে একটুও দ্বিধা করে না।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা। দ্বীনের ব্যাপারে এটা ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এমন যে কোন ব্যক্তি এটা বুঝে যে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে চিকিৎসক হিসাবে মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে সঁপে দেবে না। চিকিৎসক হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়তে হবে। হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তেমনি-ভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। এ কাজ শুধু ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন এবং সে অনুযায়ী কাজও করে। প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে। ঐ সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে তার মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে কোন ইল্‌ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং যার যেমন খুশী এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেবে! কেউ কেউ বলেন, খোদ কোরআন মজীদেই রয়েছে যে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

"নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি।" কাজেই কোরআন একটি সহজ গ্রন্থ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লম্বা-চওড়া ইল্‌ম বা বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল ব্যাপার হলো, কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনা-বলী, শিক্ষা ও নসীহতমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ বস্তুজগতের

স্থায়িত্বহীনতা, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন কথা, জীবনের অন্যান্য সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়সমূহ ইত্যাদি। এ ধরনের আয়াত-সমূহ সত্যিই সহজ-সরল। আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত বুঝতে এবং এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে বর্ণিত لِلذِّكْرِ (উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে) শব্দও একথাই বোঝায়।

২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্বলিত। এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমূহের উদ্ভাবন করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। এজন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন লোককে পূর্ণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। বস্তুত এ কারণেই সাহাবায়ে-কেরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্যে অপর কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মহানবী (সা)-র নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা করতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবু আবদুর রহমান সিলমী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ আমাদের বলেছেন ঃ আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম তখন এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্তে আনার পূর্বে রাসূল (সা)-এর সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন ঃ

تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا

"আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি (আমল) এক সাথেই শিখেছি।"

হাদীস গ্রন্থ 'মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একমাত্র সূরা বাক্কারাহ্ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সূরা বাক্কারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান পড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো। (ইতক্কান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬)

লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন—সামান্য মনোযোগের দ্বারা যাঁরা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন—কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাঁদেরকেও এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সূরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে যেতো। তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার জন্যে শুধু আরবী ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং

এজন্য হযরত (সা)-এর সংসর্গ ও তাঁর শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট কথা যে, সাহাবায়ে-কেরামকে যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও "কোরআনের আলেম" হবার জন্য যথারীতি হুযুর (সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন নাযিলের প্রায় দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ পড়েই কোরআনের মুফাস্‌সির হবার দাবী যে কত বড় ঔদ্ধত্য এবং ইল্‌মে-দ্বীনের সাথে কিরূপ দুঃখজনক বিদ্রূপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের মহানবী (সা)-র বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত ঃ

من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده فى النار

'যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামেই নিজের স্থান করে নেয়।" (আবূ দাউদ, ইতকান)

হযরত (সা) আরও বলেছেন ঃ

من تكلم فى القران برأيه فاصاب فقد اخطأ

"কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুদ্ধ হলেও বক্তার পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ।"

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর

মহানবী (সা)-র তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোরআন মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো (ধর্ম) গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত গ্রন্থে ঐ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। তবে আমি শুধু এখানে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ তফসীর গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেগুলো থেকে এই তফসীর গ্রন্থ লেখার সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে স্থানে যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এ তফসীর লেখার সময় বহু তফসীর এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানের শত শত গ্রন্থ আমার সামনে ছিল। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সকল তফসীরের আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরে ইবনে জরীর ঃ এ তফসীরের প্রকৃত নাম 'জামেউল-বায়ান'। লেখক আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (র) (ওফাত ৩১০ হিঃ)। আল্লামা তাবারী একজন উঁচু স্তরের মুফাসসির এবং মুহাদ্দেস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৪৫)

কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন

"আহলে-সুন্নত আল-জমায়াতভুক্ত" অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়।

আল্লামা তাবারীর তফসীরখানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তফসীরসমূহের জন্য এ তফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াত-সমূহের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। অবশ্য তাঁর তফসীরে 'সহীহ্' বর্ণনার সাথে 'সকীম' (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, ঐ সময় কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর ঃ এ তফসীরের লেখক হাফেয এমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশ্কী শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ)। ইনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্ডিত আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশী স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দেস-সুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তফসীরুল-কুরতুবী ঃ তফসীরের পুরো নাম "আল-জামে লে-আহকামিল-কোরআন।" স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলেম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ হিঃ) হচ্ছেন এ তফসীরের লেখক। তিনি ফেক্হী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। এবাদত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, 'এরাব' (স্বর-চিহ্ন) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-কুরতুবী ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।

তফসীরে কবীর ঃ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (ওফাত ৬০৬ হিঃ)। কিতাবের নাম 'মাফাতীহুল-গায়েব'। কিন্তু পরবর্তীকালে 'তফসীরে কবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রাযী ছিলেন 'কালামশাস্ত্রের' ইমাম। এ

কারণেই তাঁর তফসীরের যুক্তি,.'কালামশাস্ত্র' সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। এ তফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাযী (র) সূরা আল-ফাত্‌হ্ পর্যন্ত এ তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সূরা আল্-ফাত্‌হ্ থেকে অবশিষ্ট অংশ লিখেছেন কাযী শাহাবুদ্দীন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হিঃ) মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হিঃ)। (কাশফুয-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাযী 'কালামশাস্ত্রীয়' আলোচনা ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর তফসীরে অধিক জোর দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ فيه كل شيء الا التفسير "এ গ্রন্থে তফসীর ছাড়া আর সব কিছুই আছে।" তফসীরে-কবীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায়। মূলত এর মর্যাদা তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে জমহুর ওলামায়ে উম্মতের অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করার মত নয়।

তফসীর আল্-বাহরুল-মুহীত ঃ আল্লামা আবু হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (ওফাত ৭৫৪ হিঃ) এ তফসীরের লেখক। তিনি ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তফসীরে কালামুল্লাহ্‌র বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক সূক্ষ্ম রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

আহকামুল-কোরআন লিল্-জাস্‌সাস ঃ ইমাম আবু বকর জাসসাস রাযী (র) (ওফাত ৩৭০ হিঃ) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফেকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। এ তফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধিসম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তবে তাদের চাইতে 'আহকামুল-কোরআন লিল্-জাসসাস'-এর স্থানই উর্ধ্বে।

তফসীর আদ্-দুররুল-মানসূর ঃ এ তফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত ৯১০ হিঃ)। এর পুরা নাম 'আদ্-দুররুল-মানসূর ফী তাফসীর বিল মাসূর'।

তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেয ইবনে জরীর (র), ইমাম বগভী (র), ইবনে মরদভিয়া (র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তাঁর গ্রন্থে একত্র করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে ঐগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্র করা, এ কারণে সুয়ূতীর এই তফসীরগ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ-সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুয়ূতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ-সূত্র কোন্ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোক-পাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

তফসীরে-মাযহারী ঃ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হিঃ) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলভী (র)-র নামানুসারে এ তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখানা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী। লেখক কোরআনের শব্দাবলীর বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

রূহুল মা'আনী ঃ তফসীরটির পুরো নাম 'রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল-কোরআনিল-আযীম ওসাস সাবায়ে মাসানী'। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমূদ আলূসী (র) এ তফসীরখানা লিখেছেন। তফসীরে রূহুল-মা'আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ-বিশ্বাস, কালাম-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো দিকের পিপাসাই যাতে পাঠকচিত্তে অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে "তফসীরে রূহুল মা'আনী" একটি সুবিস্তৃত তফসীরগ্রন্থ। তফসীর সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে এ কিতাবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে

কোরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্ পাকের খাস রহম করমে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন রচনার সকল উপকরণ একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 'তফসীর'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (র) রচিত বয়ানুল-কোরআন আরো সহজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের চাহিদানুযায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু সে কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ্র শোকর যে, মা'আরেফুল-কোরআনের মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ তফসীর প্রধানত হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপার হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা। কেননা কোরআনের আয়াত ভাষান্তরিত করার অর্থ সে ভাষায় আল্লাহ্র কালামকে ব্যক্ত করা। এর মধ্যে সামান্যতম তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি নিজের তরফ থেকে আয়াতের তরজমা করার দুঃসাহসই করিনি! বস্তুত এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আমাদের পূর্বসূরি সাধক আলেমগণ বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সাথে এ কাজ করে গেছেন। উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্র দুই সুযোগ্য সন্তান—শাহ্ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদের—এমন দক্ষতার সাথে অনুবাদের কাজ আন্জাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির আশংকা খুবই কম।

হযরত শাহ রফীউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। পরিভাষার বা উর্দূ ভাষার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের প্রতিটি শব্দ উর্দূ ভাষায় চলে এসেছে। কিন্তু হযরত শাহ্ আবদুল কাদের শাব্দিক অনুবাদের সাথে সাথে পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ্ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল একাধারে মসজিদে এ'তেকাফের জীবন-যাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং মসজিদের চত্বর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দারুল-উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব-এর মন্তব্য, "নিঃসন্দেহে এ তরজমা এলহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত অনুবাদ কর্ম সম্ভবই হতে পারে না।"

শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) তাঁর যমানায় যখন অনুভব করলেন যে, উর্দূ পরিভাষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হযরত শাহ্

আবদুল কাদেরের অনুবাদ সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নতুন করে আধুনিক পরিভাষার আলোকে তরজমা করেছেন। সে তরজমাই শায়খুল-হিন্দ-এর তরজমা নামে খ্যাত হয়েছে। আমি আয়াতের অনুবাদ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল-হিন্দের সে তরজমাই অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু তুলে দিয়েছি।

দুই. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) 'তফসীরে বয়ানুল-কোর-আন' এমন এক চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বন্ধনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত তফসীরও বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী যে, হযরত মাওলানার জীবৎকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংযুক্ত করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআনের একটা সহজ সংস্করণ তৈরী করাই যেহেতু আমার দীর্ঘ কালের লালিত স্বপ্ন, সেজন্য তরজমার পর 'তফসীরের সারসংক্ষেপ' নামে আমি হযরত থানবী (র)-র বিস্তারিত তরজমা অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি। নিজের তরফ থেকে আমি শুধু পরিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। হযরত থানবী (র)-র 'খোলাসায়ে-তফসীর' প্রকৃতপক্ষে একাধারে যেমন তরজমার বিস্তারিত রূপ তেমন অপরদিকে তফসীরের সার-সংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আমি তফসীরের প্রথম সে সারসংক্ষেপটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করেছি। এর মধ্যে যেসব তত্ত্বকথা একটু কঠিন মনে হয়েছে সে অংশগুলো পরবর্তী 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে' সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। যদি কেউ শুধু তফসীরের সারসংক্ষেপটুকুও মোটামুটিভাবে পড়ে নেন, তবে তার পক্ষে তফসীর সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।

এরপর ফেকাহ্-সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কোরআন শরীফের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা হয়েছে।

তিন. তৃতীয় কাজ হচ্ছে 'মা'আরেফ ও মাসায়েল'। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলেমগণের তফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমি সহজ উর্দু ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরি-বেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে—

(ক) আলেমগণের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকারশাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্বেরাআত প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, আজকাল অনেক আলেমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা অর্জন করার

চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরক্তিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান-অর্জন করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায় যে, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্য সত্যই খুব কঠিন কাজ। অথচ কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ—এমন সম্পর্ক যদ্দ্বারা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুজগতের আকর্ষণ যেন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এবং বান্দার মধ্যে দুনিয়ার চাইতে আখেরাতের ফিকির বেশী প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে এমন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় যে, আমার এ কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের মর্জির খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কি না! এ শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে দিয়েছে যে, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি পড়ে নিয়ে এবং লেখাপড়া না জানা লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?

তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে।

(খ) নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ বর্তমানে যেমন সকল মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র কিতাব, তেমনি এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নির্ভুল পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে নাযিল হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে সবেরও সঠিক সমাধান কোরআনের মধ্যে রয়েছে। তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে হবে। এ কারণেই প্রতি যুগের আলেমগণ যুগ-সমস্যার

আলোকে কোরআনের তফসীর রচনা করেছেন। তাঁদের যমানায় বিধর্মী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর তরফ থেকে দ্বীনের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব বিভ্রান্তির সঠিক জবাব পেশ করেছেন। মধ্যযুগের তফসীর গ্রন্থগুলো সে একই কারণে মু'তাযেলা, জাহমিয়া, সাফওয়ানিয়্যাহ প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদীর যথার্থ জবাবে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

পূর্ববর্তিগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-খৃস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট যেসব প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, নতুন উত্থাপিত এসব প্রশ্নের জবাব দান করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্‌র ইমামগণের বক্তব্য উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও কোন ইশারা বা নজীর রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখেছি। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমার সে অন্বেষণ ব্যর্থ হয়নি। সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও ত্রুটি করিনি। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন জবাব যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ ভঞ্জনের খাতিরে দ্বীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবতন বা সে ধরনের কোন সামঞ্জস্য বিধানের অপচেষ্টাও কোথাও করা হয়নি। অবশ্য এসব কিছু আমি আমার জ্ঞান ও ধারণার মাধ্যমেই করতে চেষ্টা করেছি। যদি এতে কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ তা'আলা সন্দেহবাদীদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন।

তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো ঃ

এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্ আবদুল কাদের-এর তরজমারই আধুনিক রূপ, সেটি হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী ব্যাখ্যামূলক তরজমা হযরত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত। এর দ্বারা মা'আরেফুল-কোরআনে দু'দুটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সমাবেশ ঘটেছে।

দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপ ঃ প্রকৃতপক্ষে যেটুকু হযরত থানবী (র)-কৃত তফসীর বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে একত্র করা হয়, তবে সেটাও সহজ-সরলভাবে কোরআনের মানে-মতলব বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরেঠি মরহুম আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তফসীর দেখিয়ে উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের একখানা তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, তফসীরের সারসংক্ষেপ অংশটুকু মরহুম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে সহায়ক হবে।

তিন. 'মা'আরেফ ও মাসায়েল' অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়) আমার সাধনার ফসল। আলহামদুলিল্লাহ্! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ইমাম মুহাদ্দেসগণের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গর্বিত, আমি সেখানে আল্লাহ্র শোক্র আদায় করছি যে, আমি পূর্বসূরিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে সবের সারনির্যাসই এ তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন মত এতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করিনি।

আল্লাহ্র তওফীকের জন্য শোকর! আকায়ে-নামদার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম।[১]

বিনীত

মুহাম্মদ শফী

দারুল উলুম, করাচী

২৫ শা'বান ১৩৯২ হিঃ

---

১. হযরত মুফতী সাহেব (র) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে।

—অনুবাদক

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

এ সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা আল্-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইক্‌রা', 'মুয্‌যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরাতুল ফাতিহা' একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন' 'উম্মুল কিতাব', 'কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বপোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে যে, এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্র নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ্ পাক তার প্রত্যুত্তরে الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে,—যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে,—সূরায়ে-ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন,—সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ—(কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ কোরআনের একটি আয়াত ঃ সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্‌লের একটি আয়াত বা অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে ... بِسْمِ اللّٰهِ... লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নাম্‌ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার

www.iscalibrary.com

অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্সহ আরম্ভ করার আদেশ ঃ জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবও বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ পবিত্র কোরআন ও উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব। উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূল করীম (সা)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই গ্রহণ করা হলো এবং সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, "যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।"

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

www.iscalibrary.com

প্রত্যেক কাজে বিস্‌মিল্লাহ্ বলার রহস্য ঃ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার আল্লাহ্‌র নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, চলাফেরাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজকর্ম এবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

কাজটা কতই না সহজ। এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা একান্তই সুদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দ্বীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু মুসলমান আহার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্য-বস্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক-একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টিলাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্যরূপে আমাকে দান করেছেন।

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। কিন্তু মুমিন তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র সাথে তার যোগাযোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহ্‌র যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মুমিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ ক'রে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যান-বাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সুষ্ঠু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কাঠ, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় করে আল্লাহ্‌র এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পয়সাও আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনি; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা

www.iscalibrary.com

মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَتَعْلِيْمَاتِهٖ۔

মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ এবং পরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহ্র তফসীর

বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত 'ইসম' ও তৃতীয়ত 'আল্লাহ্'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক—সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই—এস্তেয়ানাত—অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া। তিন—কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ্' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে-আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক ; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে 'বা'-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

কিন্তু তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য 'ইলমে নাহবের' (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহা ধরে নিতে হয়। যথা, 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি

www.iscalibrary.com

বা পড়ছি।' এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে হবে, যাতে 'আরম্ভ আল্লাহ্‌র নামে' কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী শুধু 'বা' বর্ণটি আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'বা' বর্ণটি 'আলিফ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং 'ইসম' শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللهِ কিন্তু মাসহাফে-উসমানীর লিখন-পদ্ধতিতে 'হামযা' বর্ণটি উহ্য রেখে 'বা'-কে 'সীন'-এর সাথে যুক্ত করে লিখে 'বা'-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরম্ভটা 'আল্লাহ্‌র নামে'ই হয়। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ এতে 'বা'-কে 'আলিফের' সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহ্‌র বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই 'বা' বর্ণকে 'ইসম'-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রাহমান ও রাহীম উভয়ই আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমত।

সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এ জন্যই 'রহমান' শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার 'যাতের' জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য 'আল্লাহ্' শব্দের ন্যায় 'রহমান' শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহু-বচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী)

'রাহীম' শব্দের অর্থ 'রহমান' শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য 'রাহীম' শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

www.iscalibrary.com

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

মাসআলা ঃ আজকাল 'আবদুর রহমান', 'ফজলুর রহমান' প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু 'রহমান' বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'রহমান' বলে ডাকা হয়। এরূপ সংক্ষেপ করা জায়েয নয়; পাপের কাজ।

জ্ঞাতব্য ঃ বিসমিল্লাহ্‌তে আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে মাত্র দু'টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু'টিই 'রহমত' শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব-চরাচর, আকাশ, বাতাস, সৃষ্টিরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত। কোন বস্তুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন।

'তাআব্বুজ' শব্দের অর্থ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা।

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে—যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ'উযুবিল্লাহ্ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ্ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'উযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধুমাত্র সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ'উযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। (আলমগিরী)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', কোরআনের সূরা নাম্‌ল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—পানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

www.iscalibrary.com

মাসআলা ঃ নামাযের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ'উযুবিল্লাহ্-এর পরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামাযের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়্যাহ্)

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'শরহে মানিয়্যাতে' একে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে-মানিয়্যাত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যেসব নামাযে নীরবে ক্বেরাআত পড়া হয়, সেসব নামাযে বিসমিল্লাহ্ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবু হানীফা (র)-র মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহ্শাস্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই।

www.iscalibrary.com

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও : ৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল

www.iscalibrary.com

সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি 'আলম' বা জগতরূপে গণ্য করা হয়। যথা—ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, জ্বিন-জগত।)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি বিচার ও প্রতিদান-দিবসের মালিক। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা তোমারই এবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও। صِرَاطَ الَّذِيْنَ

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ—সে সমস্ত লোকের পথ, যাহাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়।

হেদায়তের পথ ত্যাগ করার দু'টি পন্থা! এক এই যে, পথের পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেয়নি— ضَآلِّيْنَ শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে! দ্বিতীয়ত পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেওয়ার পর এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি। مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে! কেননা, জেনে-শুনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু ঃ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতের মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন—নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত; অর্ধেক আমার

www.iscalibrary.com

জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা; এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এইসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাযহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থান যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে

www.iscalibrary.com

যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম "রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয়। আরবী ভাষায় رَبٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা—আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরে-শতাকুল, জ্বিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়-পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে

www.iscalibrary.com

যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে। আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকী-গুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার। (কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রাযী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধি-বাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন?

আজ থেকে প্রায় সাতশ সত্তর বছর আগে যখন মহাশূন্য ভ্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাযী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশূন্য ভ্রমণকারিরা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাযীর বর্ণনার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে

www.iscalibrary.com

সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রাযীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশূন্য ভ্রমণকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশূন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য খাদ্য, যা সে তার মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও যমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনি ভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়! সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্ম অনর্থক নয়; বরং তারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই রয়েছে।

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ, জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত

www.iscalibrary.com

প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رَحْمٰنِ ও رَحِيْمِ শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই "গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য" যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

مٰلِكٌ শব্দ مَلِكٌ ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دِيْنٌ অর্থ প্রতিদান দেয়া। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর শাব্দিক অর্থ—প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে 'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে থাকবে। (কাশ্শাফ)

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টি-রাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

www.iscalibrary.com

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, 'প্রতিদান-দিবস' সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 'রোযে-জাযা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র। অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশ বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদল হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

অর্থাৎ, এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

www.iscalibrary.com

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ—এরূপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে!

মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা-স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতর্কীকরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র। কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও শাস্তি হবে পরকালে। যেদিন সে শান্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধিও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও মন্দ যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজন্যই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন। যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই 'প্রতিদান দিবস'—কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়।

সূরা আল-মু'মিনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِىْٓءُ ط قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

অর্থাৎ—অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

www.iscalibrary.com

মালিক কে ?

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ—প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে 'প্রতিদান-দিবসের' এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ীঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তার হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-মু'মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِّمَنِ

www.iscalibrary.com

الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

অর্থ—"যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের কোন কথাই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব? (উত্তরে) সে আল্লাহ্ তা'আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।"

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে-সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্র একত্ব-বাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা ঃ—اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত। نَعْبُدُ শব্দ عبادت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। نَسْتَعِيْنُ استعانت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ এবং الرَّحِيْمِ এ দুটি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখা-পেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল

www.iscalibrary.com

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্ তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, "আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাস-সিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত

www.iscalibrary.com

এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ইবাদত শুধু নামায-রোযারই নাম নয়। ইমাম গায্যালী স্বীয় গ্রন্থ 'আরবাঈন'-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা—নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রুকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

অর্থাৎ—আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনি-ভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি?

www.iscalibrary.com

এ প্রশ্নের উত্তর 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা যেসব পরস্পর বিরোধিতা আঁচ করেন তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়।

ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা।' তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দুটি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থাৎ—এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র প্রশংসার তস্‌বীহ্ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ -

www.iscalibrary.com

অর্থাৎ—তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষত পাখীকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ওদের তসবীহ্ সম্পর্কে খবর রাখেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শরয়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা—জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, মানবমণ্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ করা হয়েছে। অর্থাৎ—"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।"

এ বিষয়ে সূরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ -

অর্থাৎ—তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের

www.iscalibrary.com

জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা—মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দুটি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও করা চলে না।

সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ـ

অর্থাৎ—আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র বান্দারূপে আগমন করেনি।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ—মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্ম-ভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

অর্থাৎ—"যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।" এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত

www.iscalibrary.com

পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মু'মিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাত্হ্তে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا অর্থাৎ মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

এক পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

www.iscalibrary.com

তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছেঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থাৎ "আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না"—এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছেঃ "আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।"

সরল পথ কোন্‌টি? 'সোজা সরল রাস্তা' সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 'ইফরাত' বা 'তফরীত' -এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছেঃ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ -যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ—যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা

www.iscalibrary.com

সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাঁদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে 'আওলিয়া' বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন—যাঁরা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে হাঁ-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ অর্থাৎ—যারা আপনার অভিসম্পাত-গ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضَالِّينَ —তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতি-রঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা—নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে বাড়াবাড়ি করেছে ; যেমন নবীদেরকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নবীদের কথা মানেনি ; এমন কি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে—আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া—"হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন।

www.iscalibrary.com

কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে ঃ এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ ছোট্ট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথমে ইতিবাচক এবং পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মুস্তাকীমকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন—যদি সিরাতে মুস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূলেরও আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াই সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে।

ফল কথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক মানুষের সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মত-গণের ন্যায় সত্তুরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই পথে থাকবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোন্ দল? প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলে-ছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন ঃ ما أنا عليه وأصحابي অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা

www.iscalibrary.com

সম্ভব হয় না, বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না।

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে। শুধু ডাক্তারী পুঁথিপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপত্র পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত দ্বীনের তা'লীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা। কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধুমাত্র কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন। প্রথম, আল্লাহ্র কিতাব—যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ্-ওয়ালাগণ। তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র কিতাবের নিরিখে তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র স্থির হয়, তাঁদের নিকট আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে।

মতানৈক্যের কারণ ঃ একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহ্র কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে; তাঁদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু লোক আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির করে আল্লাহ্র কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এ দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী।

www.iscalibrary.com

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর তাঁর এবাদতের উল্লেখ রয়েছে। এদতসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহ্র সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ। অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

দোয়া করার পদ্ধতি ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ঃ এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ-

www.iscalibrary.com

তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণত মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ অর্থাৎ, "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।" এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্য-টুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভিতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি। এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

www.iscalibrary.com

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেওয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপ-ভোগ্য; যথা—আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত। বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে الحمد ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ বা প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষ-স্থানে রাখা হয়েছে।

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে الحمد لله বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার الحمد বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী)

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে الحمد لله বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ্‌ হাদীসে আছে যে, الحمد لله পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম الحمد-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার কাছেও যেও না।

www.iscalibrary.com

দ্বিতীয় শব্দ 'اللّٰه' এর সাথে 'لام' বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস 'لام' বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তা'রীফ বা প্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তারীফ বা প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তা'রীফ বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর করে না।

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েয নয়ঃ কোন মানুষের জন্য নিজের তারীফ বা প্রশংসা করা জায়েয নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবী করো না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী। কেননা, মানুষের পক্ষে তা'রীফ বা প্রশংসার যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্ভরশীল। কার পরহেযগারী কোন্ স্তরের তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্র প্রশংসা বা তা'রীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই। পরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন ঃ لا احصى ثناء عليك আমি আপনার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তা'রীফ বা প্রশংসার পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

'রব' আল্লাহ্র এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্বোধন জায়েয নয়ঃ কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন সত্তার প্রতিই কেবল 'রব' শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এ শব্দ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'রব' বলা জায়েয নয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার মালিককে 'রব' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে। অবশ্য

www.iscalibrary.com

বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, রাব্বুল-বাইত,—বাড়ীর মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ —এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ সমগ্র সূরা আল-ফাতিহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে। যথা ঃ

—فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (هود)

—قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (ملك)

—رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (مزمل)

এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে যে, মু'মিন স্বীয় আমল বা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু'টি মাস'আলারও মীমাংসা হয়ে গেছে। যথা ঃ

এক. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয়। তাঁর এবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঃ ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা

www.iscalibrary.com

বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া, যা আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত শিরকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আদী ইবনে হাতেম খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের এবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি কি ভাবে এ অপবাদ দিয়েছে? প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন ঃ "পুরোহিত আলেমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হারাম বলেছেন? আ'দী ইবনে হাতেম স্বীকার করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের এবাদতই হলো।"

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই; কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - অর্থাৎ, "যদি আল্লাহ্‌র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।"

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শিরক। প্রয়োজন মেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

www.iscalibrary.com

হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন—ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয়! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃস্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন ক্রস-এর বিকল্প নেকটাই সগৌরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই إِيَّاكَ نَعْبُدُ -তে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাস'আলা ঃ কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না। যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মমতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া—ইহা প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

www.iscalibrary.com

দুই—সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু'মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব-দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে; যথা, মু'জেযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,—এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ -

বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শত্রুসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে,—"হে মুহাম্মদ (সা)! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্

www.iscalibrary.com

তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।" এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্‌রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ মু'জেযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

অর্থাৎ, "কোন মু'জেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।" তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জেযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

একটি স্থূল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, ঘরে বসে আমরা যে বাল্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে বাল্ব ও পাখা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের উপরই নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাল্ব আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে। কেননা. এ আলো বাল্বের নয়; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাল্ব ও পাখার মধ্যে পৌঁছে থাকে। নবী, রাসূল, আওলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছায়ই বাল্ব ও পাখার মধ্যে

www.iscalibrary.com

বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আওলিয়াগণের মাধ্যমে মু'জেযা ও কারামতরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

এ উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মু'জেযা ও কারামত প্রতিফলনে নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাল্ব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জেযা ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাল্‌ব এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ, তাতে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা'র ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্ব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয বা একেবারেই না-জায়েয বলা সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাঁদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শিরক হবে। কিন্তু যদি তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়।

সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েতই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল

www.iscalibrary.com

পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

وَاللّٰهُ اَسْأَلُ الصَّوَابَ وَالسَّدَادَ وَبِيَدِهِ الْمَبْدَاءُ وَالْمَعَادُ -

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মু'মিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ -

www.iscalibrary.com

سورة البقرة

সূরা আল-বাক্কারাহ

নামকরণ ও আয়াত সংখ্যা ঃ এ সূরার নাম 'সূরা আল্-বাক্কারাহ'। হাদীসেও এ নামেরই উল্লেখ রয়েছে। যে বর্ণনায় এ সূরাকে 'সূরা আল্-বাক্কারাহ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে সে বর্ণনা ঠিক নয়। (ইবনে-কাসীর)

এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, শব্দ সংখ্যা ৬২২১, বর্ণসংখ্যা ৫০,৫০০।

অবতরণকাল ঃ এ সূরাটি মদনী। অর্থাৎ, নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার পর অবতীর্ণ হয়। অবশ্য কয়েকটি আয়াত হজ্বের সময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তফসীরকারগণ ঐ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলেছেন।

সূরা আল্-বাক্কারাহ কোরআনের সবচাইতে বড় সূরা। হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম এ সূরারই অবতরণ শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হতে থাকে। সূদ সম্পর্কিত আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়। وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতগুলির একটি। দশম হিজরীর দশই যিলহজ্ব বিদায় হজ্বের সময় এটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০/৯০ দিন পর নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেন এবং ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

সূরা বাক্কারার ফযীলত ঃ এ সূরা বহু আহ্কাম সম্বলিত সব চাইতে বড় সূরা। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাক্কারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে-বাতিল কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-র এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে আহ্লে-বাতিল অর্থ যাদুকর। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে তার উপর কোন যাদুকরের যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (কুরতুবী, মুসলিম, আবু উমামা বাহেলী)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, "যে ঘরে সূরা বাক্কারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।" (ইবনে কাসীর হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন)

নবী করীম (সা) এ সূরাকে سنام القرآن (সেনামুল-কোরআন) ও ذروة القرآن (যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে বলা হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে

www.iscalibrary.com

বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে-বাক্কারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। (ইবনে-কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছেঃ সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দুটি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহ্‌কাম ও মাসায়েলঃ বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্কারাহ সমগ্র কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র) বলেছেন যে, তিনি তাঁর বুযুর্গানের নিকট শুনেছেন—এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই হযরত ওমর ফারুক (রা) এ সূরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন। (কুরতুবী)

প্রকৃতপক্ষে সূরাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর মৌলিক বিষয়বস্তু তিনটি। এক. আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ, তিনিই যে, সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এ তথ্যের বর্ণনা। দুই. আল্লাহ্ তা'আলাই এবাদতের একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য না হওয়া। তিন. হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সূরা-ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর। যদি কেউ সরল ও সত্য পথের সন্ধান চায়, তবে সে পবিত্র কোরআনেই তা পেতে পারে।

সে জন্যই সূরাতুল-ফাতিহার পর সূরা বাক্কারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বারা সূরা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান করছ তা হচ্ছে এ কিতাব। অতঃপর এ সূরার প্রথমে ঈমানের মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সূরার শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যভাগে জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ যথা এবাদত, আচার-ব্যবহার, মুয়াশেরাত, চরিত্র গঠন এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংস্কার সম্পর্কিত মূলনীতি ছাড়াও অন্যান্য বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

www.iscalibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ লা-ম-মী-ম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য; (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর, যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে! আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কিতাব আল্লাহ্ প্রদত্ত (এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন অর্বাচীন যদি এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবতারণা করে, তাতে কিছু যায়-আসে না।

www.iscalibrary.com

কেননা, কোন স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের প্রতি কেউ সন্দেহের অবতারণা করলেও সে সত্য বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, বরং সত্য সত্যই থাকে।) যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, এ কিতাব তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। (অর্থাৎ, যেসব বিষয় জ্ঞান ও পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির উর্ধ্বে সে সব বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যারা সত্য বলে গ্রহণ করে) এবং নামায কায়েম করে (নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে যে, নামায সময়মত এর শর্ত ও আরকান-আহ্‌কাম যথারীতি পালন করে আদায় করা) এবং আমি যা কিছু দান করেছি তা থেকে সৎপথে ব্যয় করে। আর ঐ সমস্ত লোক এমন যারা বিশ্বাস করে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (অর্থাৎ, কোরআনের প্রতি তাদের যেরূপ ঈমান রয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহেও ঈমান রয়েছে। কোন বিষয় সত্য বলে জানার নাম ঈমান। আমল করা অন্য কথা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করার পূর্বে যে সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করা ফরয এবং ঈমানের শর্ত। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, ঐ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছিলেন এবং সেসব কিতাবও সহীহ। স্বার্থান্বেষী লোকেরা ঐগুলোতে যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস নয়। কিন্তু আমল করতে হবে কোরআন অনুযায়ী; পূর্ববর্তী কিতাবগুলো মনসুখ বা রহিত বলে গণ্য হবে। সেগুলো অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে না।) এবং তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সত্যপথের উপর রয়েছে এবং এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ মাত্রায় সফলকাম। (এ সমস্ত লোক পার্থিব জীবনে সত্যপথের মত বড় নেয়ামতপ্রাপ্ত এবং পরকালেও তারা সকল প্রকার কামিয়াবী লাভ করবে।)

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ ذٰلِكَ এ শব্দটি দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। رَيْب সন্দেহ। هُدًى হেদায়েত। مُتَّقِيْن যাদের মধ্যে ধর্মভীরুতা বা তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণাবলী বিদ্যমান, তাদেরকে মুত্তাকীন বলা হয়। تَقْوٰى শব্দের অর্থ বিরত থাকা। এ স্থলে এর অর্থ হবে ঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। غَيْب অদৃশ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত তথ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে এবং

www.iscalibrary.com

ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে। يُقِيمُونَ শব্দটি اقامت হতে গঠিত; অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তুকে সোজা করা। নামায সোজা করার অর্থ হচ্ছে, একাগ্রচিত্তে আদায় করা। رَزَقْنٰهُمْ শব্দটি رزق হতে উদ্ভূত। অর্থ, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ দান করা। يُنْفِقُونَ শব্দটি انفاق হতে উদ্ভূত। অর্থ, ব্যয় করা। اٰخِرَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শেষ বা পরে সংঘটিত হবে এমন সব বিষয়। এ স্থলে ইহকালের বিপরীত পরকাল। يُوقِنُونَ শব্দটি ايقان হতে উদ্ভূত। ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে—যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকে। مُفْلِحُونَ শব্দটি افلاح শব্দ থেকে এবং তা فلاح শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ, পূর্ণ সফলতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হরূফে মুকাত্তা'আতের বিশদ আলোচনা ঃ অনেকগুলো সূরার প্রারম্ভে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা الٓمٓصٓ-الٓمٓ حٰمٓ এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় 'হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। এ অক্ষর-গুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা ঃ—الف - لام - ميم (আলিফ-লাম-মীম)।

কোন কোন তফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নামের তত্ত্ব বিশেষ।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা'আতগুলো এমন রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কাউকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি। হয়তো রাসূল (সা)-কে এগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, কিন্তু উম্মতের মধ্যে এর প্রচার ও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইমাম কুরতুবী এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে—আমের, শা'বী সুফিয়ান সওরী এবং একদল মুহাদ্দেস বলেছেন যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের এক-একটি বিশেষ ভেদ বা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। আর 'হরূফে মুকাত্তা'আত' পবিত্র কোরআনের

www.iscalibrary.com

সে নিগূঢ় তত্ত্ব ও ভেদ। যার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া বা মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য মহা উপকার নিহিত রয়েছে। এগুলোতে বিশ্বাস করা ও এগুলোর তেলাওয়াত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ। এর তেলাওয়াত আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের জন্য গোপনীয় বরকত পেঁছাতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী আরো লিখেছেন ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে হবে ; কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তত্ত্ব সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না।

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলেম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, তাঁরা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ সাধারণত ذٰلِكَ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। الكتب দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।

ريب অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে—ইহা এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইহা বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল-ফাতিহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর। ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে—আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালামে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন

www.iscalibrary.com

শরীফে রয়েছে। যেমন, إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ—যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই)।

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ—যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে—তাদের জন্য হেদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশ্বচরাচরের জন্য ব্যাপক। সূরাতুল-ফাতিহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। এক. সমগ্র মানবজাতি, প্রাণিজগৎ তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপৃত। দুই. মুসলমানদের জন্য খাস। তিন. যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তথাপি হেদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানের কোথাও 'আম' বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকীগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশী প্রয়োজন তো ঐ সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পথপ্রদর্শক, অন্যের জন্য নয়।

মুত্তাকীগণের গুণাবলী ঃ পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত ঐ দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং ঐ সকল লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করা। আর এজন্যই মুত্তাকীগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্ প্রদত্ত সৎপথপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম।

www.iscalibrary.com

পূর্বোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই ঐ সমস্ত গুণের বিশ্লেষণ পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বীয় জীবিকা হতে সৎপথে ব্যয় করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। সেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঈমানের সংজ্ঞা ঃ ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দুটির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরাপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

'ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরা সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরা কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রাসূল (সা)-এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের উপর বিশ্বাসবশত মেনে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। غيب—এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু, যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না,—ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না।

কোরআন শরীফে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে

www.iscalibrary.com

যার সংবাদ রাসূল (সা) দিয়েছেন এবং মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যার জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

غَيْبٌ শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা বাক্কারার শেষে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তা রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকায়েদে-তাহাবী' ও 'আকায়েদে-নসফী'-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, জানার নাম ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা আন্তরিকভাবে জানত, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ ইক্বামতে-সালাত ঃ ইক্বামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায আদায় করা নয়, বরং নামাযকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। 'ইক্বামত' অর্থ নামাযের সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্বামতে-সালাত।

তৃতীয় বিষয়ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি, যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সব কিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত اِنْفَاقٌ শব্দ নফল

www.iscalibrary.com

দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব স্থানে زَكٰوةٌ শব্দই আনা হয়েছে।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ -এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা সৎপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহ্‌র দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কোন এহ্‌সান হবে না। তবে এ আয়াতে مِمَّا শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে।

মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব সকলেরই জানা যে, ঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল 'আমল কবুল হওয়া ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ঈমানের সাথে 'আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। কিন্তু এস্থলে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত 'আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের 'আমল রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহের সাথে অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এবাদতে-বদনী বা দৈহিক এবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এস্থলে নামাযের বর্ণনার মধ্যে এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই انفاق শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় এবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ তারাই মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং 'আমলও পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং 'আমল এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তাই ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের আলোচনাও এস্থলে করতে হয়।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত ও তাঁবেদার হওয়াকে ইসলাম বলে।

www.iscalibrary.com

ঈমানের স্থান অন্তর, ইসলামের স্থানও অন্তরই এবং তৎসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌলিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোট কথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে 'নেফাক্ব' বলে। নেফাক্বকে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ, 'মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।' অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। যথা—

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ -

অর্থাৎ, কাফেরগণ রাসূল (সা) এবং তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا -

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহঙ্কারপ্রসূত।

আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশমীরী (র) এ বিষয়টি নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন ঃ "ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর

www.iscalibrary.com

থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ 'আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য 'আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য 'আমল পর্যন্ত না পৌঁছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছালে সে ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয় না।" ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হুমাম 'মুসামেরা' নামক গ্রন্থে এ অভিমতকে সকল আহ্‌লে হক-এর অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -

অর্থাৎ, মুত্তাকীগণ এমন লোক যারা আপনার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে আর পরকালের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

এ আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণের বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল্ গায়েব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর যমানায় মু'মিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন ; একশ্রেণী হল তাঁরা, যাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ; অন্য শ্রেণী হল তাঁরা, যাঁরা প্রথমে আহ্‌লে কিতাব ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন-না-কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত কোরআনের প্রতি ঈমান এবং 'আমলের জন্য, দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য

www.iscalibrary.com

আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়েছে, তাই এখন আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই হবে।

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীলঃ এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষ নবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত, ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কমবেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহ্র অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির ন্যায় পরবর্তী কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অন্যূন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরত (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতে পরবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখতে পাওয়া যায় না।

যথা ঃ

(১) সূরা নমল— وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

(২) সূরা মু'মীন— وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ

(৩) সূরা রূম— وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

(৪) সূরা নিসা— وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ

www.iscalibrary.com

(৫) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ—(সূরা যুমার)

(৬) كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ—(সূরা বাক্বারা)

(৭) كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ—(সূরা বাক্বারা)

(৮) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا—(সূরা বনী-ইস্‌রাঈল)

এ আয়াতগুলোতে এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াতে যেখানেই নবী-রাসূল, ওহী ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই مِن قَبْل এবং مِن قَبْلِكَ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও مِن بَعْد শব্দের ইশারা পর্যন্ত নেই। যদি কোরআনের অন্য আয়াতে খতমে-নবুয়ত এবং ওহীর ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির উল্লেখ নাও থাকত, তবুও পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনাভঙ্গিই বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আখেরাতের প্রতি ঈমান ঃ এ আয়াতে মুত্তাকীগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাস-স্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে 'দারুল-ক্বারার', 'দারুল-হায়াওয়ান' এবং 'ওকবা' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস ঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি ঈমান বিল-গায়েব-এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য সকল জাতির মোকাবেলায়

www.iscalibrary.com

একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক দুনিয়ার জীবন এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যেসব তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্য-বোধকে বিসর্জন দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই—এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্র শুদ্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের ধাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না।

প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধ ঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি—আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিরাজমান এক মহাসত্তার সম্মুখে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এমন সব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক

www.iscalibrary.com

সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চেহারা, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই লোক ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত।

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُونَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوقِنُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াকীনের বিপরীতে সন্দেহ সংশয়। এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না ; বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কে হয়ে থাকে।

মুত্তাকীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান—সব কিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মু'মিনও বলা হয়, কিন্তু কোরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াকীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়েত এবং সফলতার সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যা সূরা-বাক্বারার পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

অর্থাৎ, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ
سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝٧

(৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্

www.iscalibrary.com

তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তারা ঈমান আনবে না। (এ কথা সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত যে, তাদের মৃত্যু কুফরীর মধ্যেই ঘটবে। এখানে সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়নি। কেননা, সাধারণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক লোক পরে মুসলমান হয়েছেন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের কানসমূহ ও তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু—সূরা বাক্বারার প্রথম পাঁচটি আয়াত কোরআনকে হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে এবং যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মু'মিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সে সমস্ত লোকের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি, বরং অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

তারা দুটি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অন্তরের ভাবধারা ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের তারা বলে, আমরা মুসলমান, কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা

www.iscalibrary.com

কোরআনকে অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত দু'টি আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, কোরআন সূরা বাক্বারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

প্রথমে রয়েছে সে দলের কথা, যাদের পথ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এ চাওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় দল যাদের পথ হতে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -এ পানাহ চাওয়া হয়েছে। কোরআনের এ শিক্ষা হতে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা-তাগাবুন-এ পরিষ্কার মীমাংসা দেওয়া হয়েছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ○

অর্থ—আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন এবং কিছুসংখ্যক কাফের হয়েছে।

আলোচ্য দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণে বশীভূত, তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সত্যকে বুঝবার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ করার মত কান আর তাদের অবশিষ্ট নেই। শেষ আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

www.iscalibrary.com

কাফেরের সংজ্ঞা ঃ كفر-এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরীকেও কুফর বলা হয়। কেননা, এতে এহ্সানকারীর এহ্সানকে গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়—যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকার করা।

যথা—ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং হক বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটি হক বলে না মানে, তা হলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে।

'এনযার' শব্দের অর্থ ঃ এনযার শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। "ابشار" এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শ্রবণে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 'এনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না ; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। "নাযীর" বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে 'নাযীর' বলা হয়। কেননা, তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যাঁরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে—সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে তাদের সামনে কথা বলা।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শ্রবণ করতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয় তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বিরামহীন চেষ্টা করছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

এর কারণস্বরূপ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর এবং চোখ-কানে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের চোখে পর্দা বা আবরণ পড়ে রয়েছে। চিন্তা করা ও অনুধাবন করার মত যেসব রাস্তা বা পথ রয়েছে তা সবই তাদের জন্য রুদ্ধ। তাই তাদের সংশোধনের আশা করাও বৃথা।

www.iscalibrary.com

কোন কিছুতে সীলমোহর এজন্যই ব্যবহার করা হয় যাতে তার মধ্যে বাইরের কোন বস্তু প্রবেশ করতে না পারে। তাদের অন্তর এবং কানে মোহর মেরে দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাই যে, তাদের মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের এ অবস্থাকেই অন্তর ও কানে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর চক্ষু সম্পর্কে সীলমোহরের পরিবর্তে পর্দা বা আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরে প্রবেশের মত কোন বিষয় বা কোন চিন্তা ও অনুভূতি কোন একদিক হতে আসে না; বরং সব দিক হতে আসে। অনুরূপভাবে কানে পৌঁছবার শব্দও চতুর্দিক হতে আসতে পারে, তা একমাত্র সীলমোহর করা হলেই রহিত হতে পারে। কিন্তু চোখের ব্যাপার স্বতন্ত্র। চোখের দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে, তাই যখন সামনে পর্দা পড়ে, তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়।

পাপের শাস্তি জাগতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ এ দু'টি আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্র-বিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুভ বুদ্ধি লোপ পায়।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর হতে দূরে চলে যায়, এ সম্পর্কে কোন বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন ঃ

إِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً بَعْدَهَا وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ حَسَنَةً بَعْدَهَا ـ

অর্থাৎ—পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরের

www.iscalibrary.com

মধ্যে সৃষ্ট এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে কোরআনে—رَانَ বা رَيْنٌ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ—o كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

তিরমিযী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন—মানুষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে এবং সে যখন তওবা করে, তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী ঃ এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে عليهم -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনের কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফ্ফিফীনের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। যথা ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা 'আবরণ' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তাই তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি।

www.iscalibrary.com

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ ﴿٨﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۭ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ
بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ
اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ
اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠
فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَاۗءَتْ

www.iscalibrary.com

مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ
لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾
اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ
اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

(৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।(১১)আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী—কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি।

www.iscalibrary.com

আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি—আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (১৫) বরং আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, সে কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফি.র আসবে না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ্ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মানবকুলের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি; অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না এবং তারা অনুভব করতে পারে না যে, এ ধোঁকার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিপূর্ণ; আর আল্লাহ্ তাদের এ ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (তাদের দুষ্কর্ম, অবিশ্বাস এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার আগুনে জ্বলা এবং তাদের কুফর প্রকাশ হওয়াতে সর্বদা তাদের দুশ্চিন্তা ও নাভিশ্বাস সবই অন্তর্ভুক্ত।) আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যা কথা বলে। (অর্থাৎ, ঈমানের মিথ্যা দাবী করে!) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে ঝগড়া ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। তাদের দু'মুখো নীতির দরুন যখন

www.iscalibrary.com

ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে থাকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যখন বলেন যে, এ জাতীয় কাজ-কর্মে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা ত্যাগ কর, তখন তারা নিজেদেরকে মীমাংসাকারী বলে দাবী করে (অর্থাৎ তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিবাদকেই মীমাংসা মনে করে)। স্মরণ রেখ, তারাই ফাসাদী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (এ তো তাদের অজ্ঞতা ও অহমিকার পরিণাম যে, নিজের দোষকে তারা গুণ মনে করে এবং সৎ ও ভাল কাজ যথা অন্যের ঈমানকে দোষ মনে করে।) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও ঈমান আন, তখন তারা বলে যে, বোকাদের মত আমরাও কি ঈমান আনব? স্মরণ রেখ, তারাই বাস্তবপক্ষে বোকা কিন্তু তারা তা বুঝে না। (এ সব মুনাফিক প্রকাশ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সাথে এভাবে কথাবার্তা বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করা না যায় এবং নিজেদের অন্তরে অবিশ্বাসকে গোপন রাখত।) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশত তখন বলত আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন মুনাফিক সরদারদের সাথে মিশত, তখন বলত আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের (মুসলমানদের) সাথে উপহাস ও তাদেরকে বিদ্রূপ করার জন্য মেলামেশা করি। (বিদ্রূপচ্ছলে আমরা তাদেরকে বলি আমরাও ঈমান এনেছি।) বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সাথে বিদ্রূপ করেন, আর তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (আল্লাহ্র বিদ্রূপের নমুনাই হচ্ছে যে, তাদেরকে সময় দিয়েছেন যাতে তারা কুফর ও অবাধ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করে; আর চরম অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন, হঠাৎ একবারে তাদের মূল উৎপাটন করবেন। তাদের বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরেই আল্লাহ্র এ কাজ, তাই একে বিদ্রূপ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি; আর তারা হেদায়েতও লাভ করেনি। (অর্থাৎ, তাদের ব্যবসার যোগ্যতাও নেই, তাই হেদায়েতের মত মূল্যবান বস্তুর পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে।) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্বলিত করে, যখন তার চারিদিক আলোকিত হয় এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছ থেকে আলো উঠিয়ে নিয়ে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেন, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। (সে ব্যক্তি এবং তার সাথিগণ যেভাবে আলোর পরে অন্ধকারে রয়ে গেল; মুনাফিকরাও অনুরূপভাবে হক ও সত্য প্রকাশ হবার পরও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে রইল। আর অন্ধকারে প্রথমোক্ত ব্যক্তির

www.iscalibrary.com

হাত, পা, কান, চক্ষু সবই অকর্মণ্য হয়ে গেল, অনুরূপভাবে গোমরাহীর অন্ধকারে শেষোক্ত ব্যক্তিদের (মুনাফিকদের) অবস্থাও তাই হলো।

তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা এখন আর ফিরবে না। (অর্থাৎ তাদের অনুভূতিতে সত্য ও হক বুঝবার মত যোগ্যতা রইল না। যে সমস্ত মুনাফিক মনখোলাভাবে কুফরীতে নিমগ্ন, ঈমানের কল্পনাও কোনদিন করেনি, তাদের এ অবস্থা। মুনাফিকদের আর একটি দল, যারা ইসলামের সত্যতা দেখে এ দিকে ধাবিত হয় কিন্তু পরে স্বার্থপরতার চাপে মত পরিবর্তন করে নেয়, পরবর্তী আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।) আর তাদের উদাহরণ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মত, যারা দুর্যোগপূর্ণ বৃষ্টির রাতে পথ চলে, যাতে অন্ধকার ও বিজলীর গর্জন হতে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফের আল্লাহ্‌রই ক্ষমতার আওতাভুক্ত। বিদ্যুতের অবস্থা যে, মনে হয় তাদের দৃষ্টিশক্তি এখনই হরণ করবে। যখন একটু আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার তখন অন্ধকার বিরাজ করে, যখন দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাদের শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান (যেভাবে এ সমস্ত লোক কখনও তুফানের দরুন, কখনও ঠাণ্ডা বায়ুর দরুন আবার কখনও বৃষ্টির দরুন পথচলা বন্ধ করে, আবার একটু সুযোগ পেলেই সামনে অগ্রসর হয়, সন্দিহান মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা আল-বাক্বারার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন এমন এক কিতাব, যা সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। অতঃপর বিশটি আয়াতের মধ্যে কোরআনকে যারা মান্য করে, আর মানে না, তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পাঁচ আয়াতে মান্যকারীদের কথা, 'মুত্তাকীন' শিরোনামে এবং অন্য দু'আয়াতে সে সমস্ত অমান্যকারীদের কথা, যারা প্রকাশ্যে অমান্য করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে সমস্ত মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মু'মিন বলে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। কোরআন তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ

www.iscalibrary.com

তারা আদৌ ঈমানদার নয়; বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোঁকা দিচ্ছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও ধোঁকা। একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) এবং মুসলমানদের সাথে ধোঁকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। (কুরতুবী)

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেবের উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র) বলেন,—যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আত্মিক ও শারীরিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমত এ থেকে স্বীয় স্রষ্টা-পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা—এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্য-ভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

www.iscalibrary.com

"আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্ তো দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তাঁরা দিন দিন শুধু হিংসার আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে—اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ—অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসসিরগণ এতে একমত। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টি-পাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মু'মিন বলা চলে না। এর বিপরীত যত ভাল কাজই হোক না কেন আর তা যত নেক-নিয়্যতেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্র নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা গোমরাহ-দেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রভৃতি আখ্যাই জুটে

www.iscalibrary.com

থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি,—মুসলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

অষ্টম আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে নিকট হতে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে কোর-আনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তাদের তেজারতের যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফরকে ক্রয় করেছে।

শেষ চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু' শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত মু'মিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত রাখত। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করত।

www.iscalibrary.com

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাস'আলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা—

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনও আছে ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়ত, এই যে, তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া।

হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার হয়, কিন্তু কার্যকলাপে হয় তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে। এ সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় 'মুলহিদ'ও বলা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا ـ

হাদীস শরীফে এসব লোককে 'যিন্দীক'ও বলা হয়েছে। যেহেতু এসব লোকের কুফরী দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হুকুমের আওতাভুক্ত। এদের জন্য স্বতন্ত্র কোন হুকুম নেই। এ জন্যই এক শ্রেণীর লোক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন যারা মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে।

বুখারী শরীফের শরাহ্ 'উমদা'তে হযরত ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে। পরিচয় হলে তাদেরকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ হয়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং

www.iscalibrary.com

কোরআনের পক্ষ হতে এই দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে ঃ

প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল। তাদেরকে রাসূল (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ্ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে আল্লাহ্কে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্ বা আখেরাত, কোনটির প্রতিই ঈমান আনেনি। একদিকে তারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে, অপরদিকে আখেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও রাসূলগণের সন্তানগণ যা কিছুই করুক না কেন, যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, পরকালে তাঁদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি হলে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে থাকে, কোরআনের ভাষায় তাকে ঈমান বলা যায় না।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা ঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা-বাক্কারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أٰمِنُوا كَمَا أٰمَنَ النَّاسُ যাতে

www.iscalibrary.com

বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণ-যোগ্য নয়। যথা ঃ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহ্মদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ -এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মু'মিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মু'মিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ হাদীস ও ফেকাহ্শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহ্লে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের স্বীকৃতি জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় জরুরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

এ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে

www.iscalibrary.com

বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না—সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল ঃ উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخَادِعُونَ اللَّهَ অর্থাৎ, এরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌কেই ধোঁকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই খারাপ আচরণ করে। প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্‌র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ—بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ—অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে একথাই বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ-

অর্থাৎ—মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর পরিচয় ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে,

www.iscalibrary.com

কপটতার মাধ্যমে জগতে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে বেড়ায় إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ এখানে إِنَّمَا শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের অর্থে সাবিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরাই তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী। আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই। কিন্তু কোরআন এ দাবীর উত্তরে বলেছে ঃ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

অর্থাৎ—স্মরণ রেখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।

এতে দু'টি বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের নিয়ত বা উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে, তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ দ্বারা এ অর্থই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়—এ সহজ বোধ সকলেরই রয়েছে। যথা—হত্যা, লুন্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোকা ও শঠতা প্রভৃতি। এগুলো বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী লোক প্রকারান্তরে এসব হতে দূরে থাকে। এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিত্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জগতে ফেতনা-ফাসাদের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোর গলায় বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণ-কামী। কিন্তু নিফাক বা হিংসা-বিদ্বেষপ্রসূত চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে চলে যায় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়, যা কোন সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিত্র হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনের পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে। আর সে ফেতনা এত মারাত্মক যে, তা হিংস্র জন্তু বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্যে রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে। কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত। যখন মানুষই

www.iscalibrary.com

মনুষ্যত্বের গণ্ডী থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে লঙ্ঘিত হয়। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা প্রত্যক্ষ করছেন। আধুনিক বিশ্বে তাহ্যীব-তমদ্দুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মুখে মুখে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত সচেতন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যবস্থাপনা ও শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও এ কাজে সদা ব্যস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন যন্ত্র নয়; এর পরিচালনা মানুষের হাতেই ন্যস্ত। যখন মানুষ মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন এ ফেতনার প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের অন্য কোন পন্থা দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য রাসূল (সা) তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মানুষ যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার জন্য পৃথকভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না। তখন আর পুলিশেরও এত বেশী প্রয়োজন হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান দেখেছেন। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই।

নবী করীম (সা)-এর উপদেশে আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের হিসাব-নিকাশের চিন্তা। এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না।

সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধ রোধ করার জন্য নতুন নতুন পন্থা বের করেন বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্র শুদ্ধির মূল উৎস, অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তাই নয়; বরং মানুষের হৃদয়-মন থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার ফিকিরে ব্যস্ত। এর পরিণাম হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু যারা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছদ্মাবরণে প্রসার লাভ করছে।

www.iscalibrary.com

তারা এজন্য মনোমুগ্ধকর এবং শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরী করে। আর স্ব স্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণের আবরণে إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ -এর ধুয়া তোলে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ও ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

অর্থাৎ—"কে কল্যাণকারী আর কে ফাসাদকারী তাআল্লাহ্ই জানেন।" তাছাড়া প্রত্যেক কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণামও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, না ফাসাদ হবে। এজন্য আপোস-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং কর্ম-পদ্ধতিও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হতে হবে। অনেক সময় কোন কোন কাজ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু তার পরিণাম দাঁড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাত্মক অকল্যাণ।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

(২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আলাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।

www.iscalibrary.com

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এর দ্বারা হয়ত তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (খোদায়ী ফরমানের ভাষায় 'হয়ত' শব্দ আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশকে ছাদরূপে তৈরী করেছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করো না। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না।

বস্তুত—তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন যে ফসল উৎপাদন করে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য কিভাবে মনে করা যেতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা ফাতিহার اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এ যে দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে সূরা আল-বাক্কারার দ্বিতীয় আয়াতে। এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে। কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কোরআনের হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব মু'মিন-মুত্তাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন-সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার এবং বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে মারাত্মক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে মিশেছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে।

এমনিভাবে সূরা বাক্কারার প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও

www.iscalibrary.com

বর্জন করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এ কথার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নিরিখে বিভক্ত করা চলে না। বরং এর সঠিক বিভক্তি একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর হেদায়েত গ্রহণকারীদেরকে এক জাতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ দু'টি ভাগকেই সূরা-হাশরে হিযবুল্লাহ্ ও হিযবুশ্ শয়তান—এ দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোট কথা, সূরা আল-বাক্বারার প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্র হেদায়েতকে মানা-না-মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

প্রথম আয়াত ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা আহবানের সূচনা হয়েছে। نَاسٌ (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাঁবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রূহুল বয়ান, খ. ১ পৃ. ৭৪,) 'রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়—স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

www.iscalibrary.com

মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে। তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তর্ভুক্ত। তবে উল্লেখিত তিন দলের প্রত্যেকের বেলায় এ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই যখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল সৃষ্টবস্তুর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে তওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ কর। মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ হবে—কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় অর্থ হবে—পাপ পরিহার করে পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন কর। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের বেলায় এর অর্থ হবে—ইবাদত ও আনুগত্যে দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর।"—(রূহুল-বয়ান)

অতঃপর 'রব' বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের সে পালনকর্তা—যিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতে 'রব'-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাতে থাকার কোন ধারণাও কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাছাড়া মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

www.iscalibrary.com

এ স্থলে خَلَقَكُمْ -এর সাথে الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদা, অর্থাৎ, গোটা মানবজাতির স্রষ্টা সেই 'রব'। অতঃপর مِنْ قَبْلِكُمْ বলেছেন, কিন্তু مِنْ بَعْدِكُمْ না বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর পর আর কোন উম্মত বা মিল্লাত হবে না। কেননা, খতমে-নবুওয়াতের পর আর কোন নবী-রসূলের আগমন হবে না এবং কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ বাক্য لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ—দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ তোমাদের জন্য একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে 'রব'-এর দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۝

অর্থাৎ—"সে সত্তাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা ফলমূল আহার্যরূপে সৃষ্টি করেছেন।" পূর্বের আয়াতে ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলো মানুষের সত্তার সাথে মিশে রয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে সে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বস্তুসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ—প্রথম আয়াতে মানবসৃষ্টি এবং দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর উপর দাঁড়ানো যাবে না; আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত—এ দুয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে।

فِرَاشٌ শব্দের দ্বারা একথা বোঝায় না যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং ভূখণ্ড গোল হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায়।

www.iscalibrary.com

কোরআন বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনাদান উপলক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও সরল-বিচক্ষণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি সহজে বুঝতে পারে। দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা। তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ। 'আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝবার কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে আগত যাবতীয় বস্তুকেই যেহেতু 'আকাশ থেকে অবতীর্ণ' বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই এরূপ বলা হয়েছে।

অধিকন্তু কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ○

অর্থাৎ—শ্বেত-শুভ্র মেঘমালা থেকে বৃষ্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۔

অর্থাৎ—আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি।

চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে মানুষের আহার্যে পরিণত করা।

আল্লাহ্র উপরোক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টা ও কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মানুষের অস্তিত্বও ছিল না। এ সম্পর্কে কোন নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মূর্তি বা দেবতা অথবা অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে।

তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে আপাতঃদৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ করে, বীজ বুনে ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরী করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে থাকে।

www.iscalibrary.com

কিন্তু কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃক্ষ সৃষ্টি ও তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুর উদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তা করুন—জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অঙ্কুর উদগমের পথে যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ থেকে অংকুর বের করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করায় কৃষকের পরিশ্রমের কোন দখল বা ভূমিকা আছে কি?

অনুরূপভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, চারা-গাছকে শীত-তাপ ও জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র কুদরতে সৃষ্ট গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার পথে বাধা দূরীকরণ পর্যন্তই কৃষকের কাজ। বলা যেতে পারে যে, পানি সেচের মাধ্যমে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি তো তাদের সৃষ্ট নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পানিকে আল্লাহ্‌রই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করবে।

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে—ফসলের গাছ সৃষ্টি, এর প্রবৃদ্ধি ও ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেষ্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব একান্তভাবেই উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি, তাকে ফলে-ফুলে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছে ঃ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝

অর্থাৎ "বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, না আমি উৎপাদন করি?"

কোরআনের এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ সবের উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, অন্য কেউ নয়।

www.iscalibrary.com

এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং বৃষ্টি বিদ্যুৎ বর্ষণ করার যে নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের কোন দখল নেই। অনুরূপভাবে বীজ থেকে ফসল ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফুলে, পত্র-পল্লবে সজ্জিত-রক্ষিত করায় এবং তদ্দ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের শ্রম নামেমাত্রই ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে এসব কাজ আল্লাহ্‌রই কুদরত ও হেকমতের ফলশ্রুতি।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দু'টি আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার জন্য আসমান, যমীন, ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিযিক তৈরী করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে?

نعمتت راخوردہ عصیاں میکنم - نعمت از تو من بغیرے - می تنم -

অর্থাৎ,—"তোমার নেয়ামত খেয়েই পাপ করি। তোমার নেয়ামত আমি ছাড়া আর কে খায়?" আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন এবং এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় সৃষ্টি তাদের খেদমত করবে, আর তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত ও খেদমত করবে। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ স্বয়ং আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে; ফলে তাদের শত শত দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

ایک در چھوڑ کے ہم ہوگئے لاکھوں کے غلام -
ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام -

অর্থাৎ—এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত হয়েছি। যন্ত্র-তন্ত্র বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি।

মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের শেষাংশে এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ—কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা তো জানই। অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্ম, তোমাদের লালন-

www.iscalibrary.com

পালন ও বর্ধন, জ্ঞান-বুদ্ধি দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরী প্রভৃতি যখনই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, তখন এবাদত-বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়।

সারকথা, এ দু'টি আয়াতে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত প্রচারের জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে। পরন্তু এক আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ।

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা 'আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক, সকল পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক ক্ষমতার অধিকারী একটি মাত্র সত্তা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, কেউ কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অনটনে সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে যোগ্যতা অর্জিত হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে পারবে যে, এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে।

বিজলী বা বাষ্পের উপাসক পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজলী ও বাষ্পের ঊর্ধ্বে আরও কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকৃত শক্তি বিজলীতেও নেই, বাষ্পেও নেই; বরং যিনি এ বিদ্যুৎ ও বাষ্প সৃষ্টি করেছেন, সে মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস। অবশ্য একথা বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীই হোক না কেন, সেই সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গার্ডের হাতে লাল ও সবুজ নিশান দেখতে পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাড়ী চলতে থাকে, আর লাল নিশান দেখালে থামে। তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে. এ নিশানগুলিই এতবড় দ্রুতগামী গাড়ী চালানো ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বুদ্ধি দেখে মানুষ তাকে উপহাস করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হল একটি নিদর্শন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। আসলে এ কাজটি চালকেরও নয়; বরং এটি ইঞ্জিনের সকল কল-কব্জার সম্মিলিত কাজ। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়—এ কাজটি

www.iscalibrary.com

চালকেরও নয়; ইঞ্জিনেরও নয়; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেই উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বস্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্রকৃত হাকীকত তোমরাও বুঝ না; চিন্তার স্থান আরও দূরে। দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন বুঝতে পারবে, বাষ্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে সত্তার, যিনি আগুন-পানি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

خاک وباد وآب وآتش بندۂ اند۔
با من وتو مردۂ با حق زندۂ اند۔

অর্থাৎ মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার কাছে মৃত, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সজীব।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয়ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ 'আশা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে উম্মিদ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিনঃ ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তওহীদে বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ মাত্র।

ہر تغیر ہے غیب کی آواز۔ ہر تجدد میں ہیں ہزاروں راز۔

অর্থাৎ—প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে রয়েছে অসংখ্য রহস্য।

স্বাভাবিকভাবেই এরূপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই

www.iscalibrary.com

বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে পারে, তবে তার জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেসবের মূলই উৎপাটিত হয়ে যাবে, তার সামনে তখন এ শিক্ষাই শুধু প্রকাশমান থাকবে যে ঃ

از خدادان خلاف دشمن ودوست - كه دل هردو درتصرف اوست -

অর্থাৎ—শত্রু-মিত্রের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের অন্তরের পরিবর্তন তাঁরই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীরা সারাবিশ্ব হতে বেপরোয়া ও সকল ভয়-ভীতির উর্ধ্বে জীবন যাপন করে। তার অবস্থা হয় নিম্নোক্ত কবিতাটির মত—

موحد چه برپائے ریزی زرش - چه فولاد هندی نهی برسرش
امید وهراسش نباشد زکس - همین است بنیاد توحید وبس

কলেমা لا إله إلا الله যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ধৃত কবিতাটির অর্থ এবং মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং সঠিক অন্তরে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও আবশ্যক। কেননা, এক আল্লাহ্র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই তাওহীদ বলে; মৌখিক স্বীকৃতিকে নয়। لا إله إلا الله পাঠ করার মত কোটি কোটি লোক এ যমানায় রয়েছে। এদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না। কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্লবী রঙে রঞ্জিত বড় একটা দেখা যায় না নতুবা অবস্থাও পূর্বেকার বুযুর্গদের মতই হতো। বৃহৎ হতে বৃহত্তর কোন শক্তিও তাদেরকে অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগণিত লোকসংখ্যা তাদের উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা পার্থিব সম্পদ তাদের অন্তরকে আল্লাহ্-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না। আল্লাহ্র নবী একা দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধ্য কারো নেই। আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থ্যও হবে না কারো।

নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছেন। তাঁদের শক্তি প্রকৃত তাওহীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমি-আপনি এবং সারা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ্ যেন এ সম্পদ দান করেন।

www.iscalibrary.com

কোরআনের অকাট্যতায় রিসালতের প্রমাণ ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

(২৩) এতদ্সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (২৪) তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও—এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না—তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। (কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে অভ্যস্ত নন। এতদসত্ত্বেও তোমরা যখন কোরআনের কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ মু'জিযা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি আল্লাহ্রই

www.iscalibrary.com

পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোযখের আগুন, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাঁচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে (কৃতঘ্ন) কাফেরদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ ঃ এ দু'টি সূরা আল-বাক্বারার তেইশ ও চব্বিশতম আয়াত। এর পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত নিয়ে আগমন করেছে, তার দু'টি স্তম্ভের একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালত। প্রথম দু'আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌র কালাম পেশ করে হুযূর (সা)-এর রিসালত প্রমাণ করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণপদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, যমীন ও আসমান সৃষ্টি করা, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি। এ দলীলের সারকথা এই যে, যখন এসব কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এবাদতও তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই এ সত্য সপ্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

www.iscalibrary.com

এজন্য তোমরা বিশ্ব-সম্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা-সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দু'টি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সা)-এর মু'জিযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রতিটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইশারা করা হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জিযা অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মু'জিযা হতে স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবৎকাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ

رَيْبٌ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে رَيْبٌ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও ريب-এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -

একই কারণে কোরআনের প্রথম সূরা আল-বাক্কারায় কোরআন সম্পর্কে বলা

www.iscalibrary.com

হয়েছে, لَا رَيْبَ فِيْهِ "এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।" আলোচ্য এ আয়াতে وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ অর্থাৎ 'যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়' বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক প্রমাণাদি সমৃদ্ধ কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না, তবু শোন! فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ সূরা শব্দের অর্থ সীমিত টুকরা। আর কোরআনের সূরা কোরআনের সেই অংশকে বলা হয়, যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই অন্য অংশ হতে পৃথক করা হয়েছে।

সমগ্র কোরআনে ছোট-বড় মোট একশত চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। আর এ স্থলে سورة শব্দটিকে 'আলিফ-লাম' বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে অথবা যদি এরূপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের ক্ষুদ্রতম যে কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা কর। তাতে যদি কৃতকার্য হতে পার, তবে তোমাদের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন মানবরচিত একটি পুস্তক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে হবে যে, এটি সত্যই মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র রচিত কালাম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা পারিনি বলে অন্য কোন লোক বা দল তা করতে পারবে না, একথা তো বলা চলে না। এজন্য এরশাদ হয়েছে ঃ

وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

شاهد - شهداء শব্দের বহুবচন, অর্থ—উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ এজন্যই বলা হয় যে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের যার যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা

www.iscalibrary.com

করতে না পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি وَلَنْ تَفْعَلُوا বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারবে না। কারণ, তা তোমাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানমাল, ইজ্জত প্রভৃতি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে কোন ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা কর; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এলো না? তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এমন এক জ্বলন্ত মু'জিযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা ঃ অন্য সমস্ত নবী ও রাসূলের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জিযা হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না,—আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাও। তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'খাসায়েসে কুবরা' গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'টি মু'জিযা হাদীসের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর! হজ্জের সময় তিনটি প্রতীক্‌কে লক্ষ লক্ষ হাজী তিন দিন পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। এ সব পাথর টুকরা তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে প্রতি বছর পাথরের এমন স্তূপ হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে

www.iscalibrary.com

যায়। একবার নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করাও নিষেধ। তাই হাজীগণ মুযদালিফা থেকে যে পাথর নিয়ে আসেন, এতে তো দু-এক বছরে পাহাড় হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয় না? হুযুর (সা) জবাব দিলেন ঃ এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যেন যে সব হাজির হজ্জ কবুল হয়, তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর টুকরাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়, আর যে সমস্ত হতভাগার হজ্জ কবুল হয় না, তাদের কংকরগুলো এখানেই থেকে যায়। এ জন্যই এখানে কংকরের সংখ্যা কমই দেখা যায়। তা না হলে এখানে পাথরের পাহাড় হয়ে যেতো (সুনানে বায়হাকীতে এ বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে)।

এটি এমন একটি হাদীস যদ্দ্বারা প্রতিবছর রসূল (সা)-এর সত্যতা প্রতীয়মান হয় এবং এমন একটি বাস্তব সত্য যে, প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে হাজার হাজার হাজী একত্রিত হয় এবং প্রত্যেক হাজী প্রতিদিন তিনটি ফলক লক্ষ্য করে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করে। কোন কোন অতি উৎসাহী লোক বড় বড় পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে এবং একথাও সত্য যে, এসব পাথরকণা পরিষ্কার করার জন্য না সরকার কোন ব্যবস্থা করে, না কোন বেসরকারী দল নিযুক্ত থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে যে, সেখান থেকে কেউ কংকর পরিষ্কার করে না। তাই পরের বছর দ্বিগুণ, তৃতীয় বছর ত্রিগুণ জমা হবে। এতে এ এলাকা প্রতীক-চিহ্নটিসহ পাথরঢাকা পড়বে, এমনকি দিনে দিনে এখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না! এ আশ্চর্যজনক বাস্তব বিষয়টি যুগে যুগে রাসূল (সা)-কে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। হুযুরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি; ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কোরআন ঃ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপারক হলো?

দ্বিতীয়ত মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দশ বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ

www.iscalibrary.com

কোন রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু—এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারক হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাস্‌সিরই স্ব স্ব বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার, মহান গ্রন্থটি কোন্ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা ঊষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে, যা ছিল 'বাত্‌হা' বা মক্কা নামে পরিচিত। এই এলাকার ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করত। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে

www.iscalibrary.com

কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল-কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক আশ্চর্য বিস্ময়, আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করত, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহ্র পবিত্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গত সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজ দিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারত। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে 'উম্মী' জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞানসূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্যসাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য,

www.iscalibrary.com

তাই মামুলী অক্ষরজ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন-না-কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে ওঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শেখেন নি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব-কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন রুচিদান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জলসায় শরীক হন নি। জীবনে কখনও একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেন নি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত; সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো।

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যান নি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দু'টি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যান নি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সেই বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করত। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহ্বান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও

www.iscalibrary.com

অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশৈলীর উপর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, "কোরজান যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারত, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসম্ভই হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। এমন সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল ; কয়েকটি বাক্যও তৈরী করতে পারল না!

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল (সা)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর স্বল্প-সংখ্যক অনুসারীকে নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরল। আরবের বড় সরদার ওত্‌বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে।" তিনি এর

www.iscalibrary.com

উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না; তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে; কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহ্‌রই রচিত কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুন্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্‌দে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশত কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে। তারা রসূল (সা)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতা-বস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করল। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সবাই তাঁর নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আমাদেরকে

www.iscalibrary.com

জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাঁকে পাগল বলে পরিচয় দিয়ে বলব, তাঁর কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরূপ বলতে বারণ করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি তাও বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী। তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়।

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তাঁর কথা-বার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করে-ছিলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নেই। সত্য বলতে কি, এ কালামে অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে। এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পণ্ডিতের বাক্যেও কখনও পাইনি।

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো? ওলীদ বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক যাদুবলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুঁৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। (খাসায়েসে-কুবরা)

www.iscalibrary.com

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে! কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যাদুকর নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক যাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবী করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবূ যর (রা) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি। কিন্তু

www.iscalibrary.com

এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বললাম—আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবূ যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় বড় শত্রু আবূ জাহ্‌ল এবং আখনাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলত যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহ্‌ল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর কাছে আল্লাহ্‌র বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারক হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে জানমাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুঁয়েমির মাধ্যমে কোন বাক্য

www.iscalibrary.com

রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ করি, সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুন্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরারা হযরতের চাচা আব্বাস (রা)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযুর (সা) তার জবাব দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরূপ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এসব স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি এমন লোকদের নয়, যারা হুযুর (সা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমির দরুন মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আবু জাহ্‌ল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর যবানী কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দৈবাৎ রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায়

www.iscalibrary.com

করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ করো না। কেননা, আরবের সাধারণ লোক এ ব্যাপার জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। পরস্পর এমন কথা বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। পরের রাতে পুনরায় তাদের কোরআন শোনার আগ্রহ জাগে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে সমবেত হয়। রাতশেষে প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাৎ হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা কোরআন শোনার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায়। রাতশেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। এবার তাঁরা সবাই বলে যে, চল এবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর কখনো একাজ করবো না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে শোরাইক লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যে, বল, মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আখনাস আবূ জাহ্লের বাড়ি গিয়ে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবু জাহল উত্তর দিল, পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে আমাদের গোত্রের শত্রুতা চলে আসছে। তারা কোন ব্যাপারে অগ্রসর হলে আমরা তাতে বাধা দিই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা করেছি। তারা সমগ্র জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে থাকিনি। সমগ্র আরববাসী জানে, আমাদের এ দু'টি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র থেকে এ ঘোষণা করা হলো যে আমাদের বংশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্র কালাম আসে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোন-দিনও আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো না।

এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মু'জিযা, যা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। (খাসায়েসে-কুব্রা)

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা—কোরআন ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী

www.iscalibrary.com

জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্য এ মাল গ্রহণও করেন নি। কেননা, এরূপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃস্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন নি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেন নি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্র কালাম ছাড়া কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ ঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ـ

অর্থাৎ—যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে। আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ـ

অর্থাৎ—তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্ কেন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

www.iscalibrary.com

ষষ্ঠ কারণ ঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে; সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا — তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য, যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ ঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযুর (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শোনেন। হুযুর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

www.iscalibrary.com

অর্থাৎ—তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্র কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে।

নবম কারণ ঃ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন্ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল। এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ

www.iscalibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাখাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণঃ কোরআনে এল্‌ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই

www.iscalibrary.com

কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা-ভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।"

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্য সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তিলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে। আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন!

অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন। আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন।

তাতে কোরআন আল্লাহ্র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সবশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি। এমনকি নিজের নামটুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তাঁর স্বভাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, খেলাধুলা, রং-তামাশা, ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি যোগ দেন নি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায়

www.iscalibrary.com

চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ। যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্র কালাম নয়, তবে এর একটি ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারক ছিল।

সমগ্র জাতির যারা তাকে আল্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। সমগ্র জাতি তাকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহ্লে-কিতাব তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর শত্রুরা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নযীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরশাদ হয়েছে—

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ -

অর্থাৎ—যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে—এরূপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মু'জিযা, যা এর আল্লাহ্র কালাম হওয়াই

www.iscalibrary.com

স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো আশ্চর্য হতে হয়।

কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শত্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি লেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুরাইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সন্ধিও ভঙ্গ করে ফেলে এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়িত করার পরিপূর্ণ সুযোগ রসূল (সা) মাত্র দু'এক বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর হুযুর (সা) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান মাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয় হয়।

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.iscalibrary.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল এমনই এক জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা-বাদশাহ্‌র শাসন মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প। আরবের মুশরিক এবং ইহুদী-নাসারাগণ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এসব কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক যে, যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি সমস্ত লোক বিনা বাক্যব্যয়ে কোরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন দর্শন, নতুন জীবনবিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রথমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ নতুন জাতির গোড়াপত্তন করা আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার জন্য কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির প্রয়োজন হতো! সেরূপ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে-কেরামের আয়ত্তাধীন ছিল? সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং আইনের শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোনরূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাতে নযীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান কোরআনের এই দাওয়াত আল্লাহ্‌রই বিশেষ কুদরতে এমন অবিশ্বাস্যভাবে আরব সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

কোরআনের অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হিজরী তৃতীয় শতকে আল্লামা জাহিয এ বিষয়ের উপর 'নয্‌মুল কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আবদুল্লাহ্ ওয়াসেতী 'এ 'জাযুল-কোরআন' নামে আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একই শতাব্দীতে ইবনে ঈসা রাব্বানী 'এ' জাযুল-কোরআন' নামে আর একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। কাজী আবূ বকর বাকিল্লানী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে 'এ' জাযুল-কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'আল্-এতকান' এবং 'খাসায়িসে-কুবরা'

www.iscalibrary.com

নামে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তফসীরে কবীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর 'এ'জাযুল-কোরআন' এবং আল্লামা রশীদ রেযা মিসরীর 'আল্ওয়াহ্য়্যাল মুহাম্মদী' এ বিষয়ের ওপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রচিত 'এ'জাযুল কোরআন' নামক পুস্তিকাটিও এ বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন।

এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশী কিতাব রচিত হয়েছে, যার নযীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহ্রই কালাম এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ঃ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করতো না, অধিকন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্ব্যতীত সূচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো, তখন কোরআনের দুশমনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার অনুরূপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হতো,

www.iscalibrary.com

তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা হতো, তবে সে গ্রন্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলেমগণও অনেক জবাবী কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল-কায্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এতই অশ্লীল, যা কোন রুচিবান মানুষের সামনে উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্ কায্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং যদি কোরআনের মোকাবেলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো। অন্তত কোরআন বিরোধীদের প্রচেষ্টায় সে সব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো।

যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে কোন কালাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে।

রোম দেশীয় একজন ক্রীতদাস মদীনায় কামারের কাজ করতো। তওরাত এবং ইনজীল সম্পর্কে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। সে মাঝে মাঝে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে যাতায়াত করতো। এ সূত্র ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে দিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ গোলামের মুখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই কোরআনের নামে প্রচার করেছেন। খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে—"যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে তো একজন অনারব; সে ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের অনুরূপ ভাষাশৈলী আয়ত্ত করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব?" সূরায়ে নাহ্লের ১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

www.iscalibrary.com

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ—ইসলামের দুশমনেরা যা বলে তাদের সে বক্তব্য আমাদের জানা আছে—"এ কোরআন আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ বিষয়টিকে জড়িত করে, সে হচ্ছে অনারব—আজমী। আর কোরআন হল একটা একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার কালাম।"

অনেকে কোরআন সম্পর্কে বলেছে— لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا অর্থাৎ —আমরাও ইচ্ছা করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতাম।

কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের মোকাবিলায় গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই—জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে। যদি কোরআনের মত কোন কালাম লেখার বা বলার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তাহলে কোরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে এর মত একটা কালাম তৈরী করে বিজয়ের শিরোপাটা নিয়েই নাও না কেন?

সারকথা, কোরআনের এ দাবীর বিরোধীরা যে একান্ত ভদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে—কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্ত্র্যের দাবীটি (নাউযুবিল্লাহ্) ভুল।

'হুযুর আকরাম (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম দেশে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পথে পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুহায়রা ছিলেন তাওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দুর্মতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন?

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরী করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্র কালাম বা মু'জিযা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়?

www.iscalibrary.com

সা'দী শীরাযীর 'গুলেস্তাঁ ফয়যীর 'নোক্‌তাবিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মু'জিযা?

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সা'দী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন ; বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলেম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ফয়যী বা হারীরী অথবা মুতানব্বী কিংবা অন্য কেউ আরবী ভাষায়, সা'দী প্রমুখ ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার গ্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃতে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিখেন যে, তাদের রচনা অন্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয়।

মু'জিযার সংজ্ঞা হল এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লেখিত মনীষীবৃন্দের যথারীতি জ্ঞানার্জন, ওস্তাদ-শিক্ষকদের সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না? তাদের কালাম যদি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেন নি, কোন মক্তব-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সা'দী আর লাখো ফয়েযী যাতে আত্মবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই অবদান বলে মেনে নেয়, তবে বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সা'দী কিংবা ফয়েযীর কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকতে পারে? তাঁরা কি নবুয়তের দাবী করেছেন? তাঁরা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মু'জিযা বলে দাবী করেছেন? কিংবা গোটা বিশ্বকে কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল?

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার ; বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রন্থনাই যে অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিষ্কে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর নযীর-বিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তিষ্কই বদলে গেছে।

www.iscalibrary.com

মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আরবের অমার্জিত-বেদুঈনরা তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তার এই বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধসমূহ একত্রিত করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে। আর হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল-আক্ওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ

ডঃ গোস্তাওলি তাঁর 'আরব সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপ বক্তব্যের মাধ্যমে দিয়েছেন ঃ

ঃ "ইসলামের সে পয়গম্বর নবীয়ে-উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে, যার আহ্বান গোটা একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এখনও সেই নবীয়ে উম্মীই আপন সমাধির ভেতর থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন।"

মিঃ গুডওয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন ঃ "আমরা যতই এ গ্রন্থকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই সেগুলো আমাদের বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে। এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, মার্জিত, মহৎ ও দীক্ষাপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে গিয়ে আরোহণ করে। সারকথা, এ গ্রন্থ সর্বযুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।" (শাহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. ১৩)

মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্ যাগলুল ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর গ্রন্থ 'দি ইসলাম'-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এতে মিঃ কাউন্ট কোরআন সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে কেমন করে বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর। সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে

www.iscalibrary.com

নিয়েছে যে, গোটা মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাত্তাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা সেই বাণী যখন ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এতে বর্ণিত বাক্যগুলো হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন তাঁর চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত বিশপও এই বলে চিৎকার করে ওঠেন, 'এ বাণী সেই উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহ।" (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃ. ১৪)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছেঃ "কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ্‌র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয়।"

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন'-এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেনঃ

"আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত

www.iscalibrary.com

হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে কিংবা উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের অমুসলমান লেখকরাও দিয়েছেন।

কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহা-দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তাঁর সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তাঁর শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ আজকের 'সুদৃঢ়' ও 'সুসংহত' ব্যবস্থাসমূহে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে যদি তার কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু সমকালের আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -

অর্থাৎ, "তোমরা যদি তার উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা তৈরী করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।"

www.iscalibrary.com

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۭ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৫) আর হে নবী (সা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সে সব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশত রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত খাবার প্রদান করা হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরূপ বলে মন্তব্য করবে। বস্তুত প্রতিবারেই তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে তাদের স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে। প্রতিবার একই ধরনের ফলপ্রাপ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভে সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল দেখে তারা মনে করবে, এত প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হবে।)

www.iscalibrary.com

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করীমের প্রতি অবিশ্বাসীদের শাস্তির বর্ণনা। আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিন্দ্যসুন্দরী স্বর্গীয় অপ্সরীদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্নাতে পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত এবং প্রস্রাব পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্তু থেকে একেবারে ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ-সমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্নাতবাসীরা অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মু'মিন যত পাপীই হোক না কেন, কোন না কোন সময় দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। (রূহুল-বয়ান)

www.iscalibrary.com

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۠ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

(২৬) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদূর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা মু'মিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। (২৭) (বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরআন পাক যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-

www.iscalibrary.com

মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র বাণী হত, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না। (এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হাঁ! যথার্থই আল্লাহ্ পাক মশা বা ততোধিক নগণ্য বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত। বাকী রইল কাফিরদের কথা—বস্তুত সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, এরূপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক অনেককে পথভ্রষ্ট করেন। আবার এরই মাধ্যমে অনেককে হেদা-য়েত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথচ্যুত করেন না। যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ, আযল দিবসের অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আত্মাই আল্লাহ্ পাককে স্বীয় রব বা পালন-কর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ্ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কই হোক; অথবা আত্মীয়-স্বজন বা সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং ভূপৃষ্ঠে কলহ সৃষ্টি করে। (কুফর, আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ ও অংশীদার নিরূপণ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। অত্যাচার, অবিচারও এ অশান্তির অন্তর্ভুক্ত।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। (ইহলৌকিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ ভোগের উপকরণ—সবই এদের নাগালের বাইরে। কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ তিক্ততা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ থাকে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোর-আন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুত

www.iscalibrary.com

এটা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্র বাণী হতো, তবে এরূপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই হতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মু'মিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়—এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন. তারা তা ছিন্ন করে! যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا—এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিকৃষ্টতায় অধিক বুঝানো হয়েছে।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত উপমাসমূহের মাধ্যমে মানবকুলের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অনেককে বিপথগামী করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধাচারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথচ্যুতির কারণও বটে।

فِسْقٌ—وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ —এর শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া।

www.iscalibrary.com

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে فُسُوقٌ বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে। এজন্য فَاسِقٌ শব্দটি كَافِرٌ -এর স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনের অধিকাংশ জায়গায় فَاسِقِيْنَ শব্দ كَافِرِيْنَ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পাপী মু'মিন-দেরকেও فاسق (ফাসিক) বলে সম্বোধন করা হয়। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় সাধারণত ফাসিক (فاسق) শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁদের পরিভাষায় ফাসিককে (فاسق) কাফির (كافر)-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তওবা করে না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় ফাসিক (فاسق) বলে পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ও গর্হিত কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে, সে ফাজির (فاجر) বলে আখ্যায়িত।

সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, কোরআন পাকে বর্ণিত এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচ্যুতি! বিপথগামী শুধু সেসব লোকই হয়, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সামান্যতম খোদাভীতিও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই লাভ করে থাকেন।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ

কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আ'হ্‌দ্ (عهد) বলা হয়। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারকে যখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক (ميثاق)।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের যৌক্তিকতা প্রসংগে মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণে পরাঙ্মুখ, কেবল তারাই দ্বিবিধ কারণে বিপথগামী হবে।

www.iscalibrary.com

১ম কারণ—এ বিরুদ্ধাচারিগণ সৃষ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ্ পাকের সাথে সমগ্র মানব কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহান স্রষ্টা তাদের আত্মাগুলোকে একত্রিত করে সবার সামনে প্রশ্ন রেখে-ছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?" প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবাই সমস্বরে স্বীকার করেছিল, "হাঁ—মহান আল্লাহ্ই আমাদের পালনকর্তা।"—আমরা যেন তাঁর আনুগত্যের সীমা এক বিন্দুও লঙ্ঘন না করি, এই ছিল এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী দাবী।

মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির সবিস্তার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে পবিত্র আসমানী গ্রন্থসহ মহান নবী ও রসূলগণের আবির্ভাব ঘটেছে। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, সে যে কোন পয়গম্বর বা আসমানী গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবে, এ আশা কিভাবে করা যায়।

২য় কারণ—তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্ পাক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, নানাবিধ কাজ-কর্মের অংশীদার, গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে বজায় রাখার নামই ইসলাম। এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার দরুন বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, "এরা ধরার বুকে অশান্তি ঘটায়। সবশেষে এদের করুণ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।"

উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয়—কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের উলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন. মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

www.iscalibrary.com

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ—(আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে—) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লংঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা মারাত্মক অপরাধ ঃ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوصَلَ (এবং আল্লাহ্ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে।) এতে বোঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এ হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ—(তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।) এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার

www.iscalibrary.com

মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য—যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সববিষয়ে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার, (অর্থাৎ—তাঁর দয়া ও অনুগ্রহরাজির কথা ভুলে অন্যকে পূজ্য বলে মেনে নাও,) অথচ (একমাত্র তিনিই যে উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ সম্পর্কে অজস্র জাজ্বল্যমান ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যথা—বীর্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণদান করলেন। পরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। অবশেষে (হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তারই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সে মহান সত্তাই ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সে সব তোমাদের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করেছেন। (এ কল্যাণ ব্যাপক। পানাহার সম্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূষা সম্পর্কেও হতে পারে, অথবা বিয়ে-শাদী অথবা আত্মার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার সম্পর্কেও হতে পারে। এদ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে এমন কোন বস্তুই নেই। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। মারাত্মক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে না, এমন নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে তা খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের) প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং (নিখুঁত ও সুবিন্যস্তভাবে) সাত (স্তরে) আসমান তৈরী করেন। আর তিনি তো সব বিষয়েই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব এবং হুযুরের রিসালাত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা

www.iscalibrary.com

সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ (তোমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করতে পার?) এরা যদিও সরাসরি আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহ্র রসূলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে তাদেরকে এরূপ সম্বোধন করা হয়েছে।

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ এখানে اَمْوَاتٌ শব্দটি مَيِّتٌ -এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيِّتٌ বলা হয়—আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করেছেন অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ (অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ—যিনি তোমাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অণুকণাগুলো সমন্বিত করে

www.iscalibrary.com

তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীরের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন!

প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের; নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

প্রথম মৃত্যু ও প্রথমবার জীবন লাভের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য ف বর্ণ যোগ করে فَأَحْيَاكُمْ বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অনুরূপভাবে এ মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরুজ্জীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং সেখানে ছুম্মা (ثُمَّ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—যার অর্থ সুদূর ভবিষ্যৎ। ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (অতঃপর তোমাদেরকে সে মহান সত্তার সমীপে ফিরিয়ে নেয়া হবে।) এর অর্থ হল হিসাব নিকাশ ও কিয়ামতের সময়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সে সব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের নিজস্ব সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি। আর তা হল মানুষের জীবন। ইহকালে ও পরকালে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্ পাকের যেসব দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল। জীবন না থাকলে আল্লাহ্র কোন অনুগ্রহের দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে আল্লাহ্ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত জীবনেরই প্রবেশদ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহবিশেষ!

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাক (সা)-এর রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে দৃশ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্বে ও মহত্বে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে সে অবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় ঃ আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের

www.iscalibrary.com

দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত—এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন কোন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (তিনিই সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এদ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে! কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট—কোন বস্তুই অনর্থক বা অহেতুক নয়ঃ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না—চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার অবদান উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সেগুলোও কোন-না-কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ্ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ

www.iscalibrary.com

করেন যে, আল্লাহ্ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই সে সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

বস্তুজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধ ঃ কোন কোন মনীষী এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীয়ত যেসব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ ও শরীয়ত-সিদ্ধ। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুর ব্যবহার কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই বিবেচিত হবে।

অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল (বৈধ)। জগতের যাবতীয় বস্তু মূলগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই বিবেচিত হবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান (র) তফসীরে বাহ্রে মুহীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত কোন মতের পক্ষেই এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, خَلَقَ لَكُمْ বাক্যে لام 'লাম' বর্ণটি 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ,—এসব বস্তু তোমাদের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতকে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা (جائز) বা নিষিদ্ধতার (حرام) দলীলরূপে দাঁড় করানো যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যক।

উল্লেখিত আয়াতে ثُمَّ শব্দের দ্বারা পূর্বে পৃথিবী ও পরে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাই সঠিক। সূরা আন্নাযে'আতে বর্ণিত وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا —(অতঃপর তিনি ভূমণ্ডল বিস্তীর্ণ করেছেন) আয়াত